মহাযুদ্ধের পরে মালয়

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে



প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

কভার ব্লক ও মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
শক্তি দত্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭, শ্যাক স্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁরা দেশের ও দশের জন্য
প্রাণ বিসর্জন করেছেন
সেই মহাপ্রাণ শহীদ্‌দের উদ্দেশে
আমার এই ভ্রমণকাহিনী
উৎসর্গিত হল

ভূমিকা

মালয় দেশ শুধু অতীতে নয়, বর্তমান যুগেও ভারতের খুব কাছাকাছি ছিল এবং আছে। অথচ এদেশের মানুষ ও ভাষা, তার সমাজ ও সমস্যা নিয়ে কোন ভাল বই বাংলা ভাষায় ছিল না। সে অভাব প্রথম পূরণ করলেন ক্যাপটেন গৌরমোহন দাস দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তিনি সারা মালয় (এবং শ্যাম দেশেরও কিছু) দেখবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি আলোচ্য বইখানিতে করেছেন। আদ্যোপান্ত পড়ে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি তাই আশা করি সমঝদার পাঠকরাও বইখানির সমাদর করবেন।

শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবে গ্রন্থকার লিপিকুশলতার পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছেন। তাছাড়া মালয়জাতির ভাষা ভাব প্রবচনাদি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে তাঁর বইখানির উপযোগিতা বাড়িয়েছেন। নিজের তোলা ছায়াচিত্র অনেকগুলি সন্নিবেশিত করায় বইখানি সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করবে। এ পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দোল-পূর্ণিমা
১৩৫৫

শ্রীকালিদাস নাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	২০	‘ওয়ার বট্‌ল্‌’	‘ওয়াটার্‌ বট্‌ল্‌’
২৭	২৪	তনি	তিনি
৩০	১৭	সাঁতরকাটা	সাঁতার কাটা
৩২	৬	মসের	মাসের
৩২	৮	প্রকোশ	প্রকোপ
৩৫	৭	cape Rachad তে	Cape Rachado-তে
৩৮	১৪	কেমাপাস	কেমপাস
৩৮	১৫	কেমাপাসের	কেমপাসের
৩৯	ছবির নিচে	আক্সের হিতুম	আয়ার হিতাম
৪৮	১৫।১৬	দরুন। এটির	দরুন এটির
৮২	৭	সবয়	সময়
৮৫	৮	‘ক্লাংমালায়’	‘ক্লাংলামায়’
৮৯	১২	প্রদর্নন	প্রদর্শন
৮৯	২২	টাইপিংএ। শুনেছিলাম	টাইপিংএ শুনেছিলাম
৯৯	১	কোয়ানটা	কোয়ানটান
১০৯	১৬	পালিস	পার্লিস
১৫৯	১৯	মালক্কা	মালাক্কা

দু-চার কথা

চুপিচুপি যুদ্ধে যাবার জন্যে যখন নাম লেখালাম, তখন সংসারের ভাল ছেলের খাতা থেকে আমি নাম-খারিজ করতে বাধ্য হলাম। কেন না সকলেই আমায় দুষতে লাগলো, কাজটা ভাল করলে না। কাজটা ভাল করলাম না খারাপ করলাম সেটা চিন্তা করবারও সময় পেলাম না কারণ তাড়াতাড়ি একটা বেডিং আর একটা ছোট্ট স্যুটকেস নিয়ে দুর্গানাম স্মরণ করে একদিন অজানার উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম। সকলের চোখে জল। সেদিন আমার চোখের কোণেও যে জল দেখা দিয়েছিল সেটা আজও ভুলিনি। যাবার সময় স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়েছিলাম যে যেখানেই যাই না কেন, যেন প্রত্যেকদিনের ডায়েরী তাঁর কাছে পাঠাই। বিদেশ থেকে শুনতাম যে বাবা, মা ও ছেলেমেয়েরা আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেই ডায়েরী পড়ে আমার অভাব কতক পরিমাণে ভুলে যেতেন। সত্যই তখন আমি আনন্দ পেতাম এবং আরও কিছু নতুন ডায়েরী পাঠাবার জন্যে উৎসাহিত হতাম। এই ডায়েরী লেখার উৎসাহে আমায় ভ্রমণের নেশাতে এমন পেয়ে বসেছিল যে মাঝে মাঝে পর্বত ও গভীর অরণ্যের মধ্যে আমায় অনেক বিপদের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। সে-কথা এখন ভাবলেও মনে শঙ্কা লাগে।

সেই সব ডায়েরীর অংশগুলি প্রবাসী, বর্তমান, চলন্তিকা, মালঞ্চ ও পূজাসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। যে-কয়জন ব্যক্তি আমার এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আমাকে

উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগ, মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ মণীন্দ্রনাথ দে, অধ্যাপক ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সান্যাল, মণিপুরের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীকামাখ্যানাথ বড়ুয়া, শ্রীনলীনি ভদ্র, শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, শ্রীচিত্তরঞ্জন নন্দী, শ্রীদেবকুমার গুপ্ত ও শ্রীপ্রফুল্ল রায় প্রভৃতিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাগজের কণ্ট্রোলের জন্যে আমার ডায়েরীর সব কটি লেখা না প্রকাশ হওয়ায় আমি দুঃখিত। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সবকটি লেখাই আমি দিতে পারবো।

এই বইখানির মধ্যে মালয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি আশাকরি সে-দেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীর মনে কৌতূহল উদ্রেক করবে। যে-কটি বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাদের নাম যথাক্রমে, "The Lights of Singapore": Roland Braddel, "The Story of Malaya": W. S. Morgan, "Malaya Rubber Statistics Handbook 1941", "Queen's Metal Handbook and Statistics 1945". আর এর সঙ্গে রয়েছে নানাবিধ সংগ্রহ—যেগুলো আমাকে অতিকষ্টে আহরণ করতে হয়েছে সেখানকার বৃদ্ধ গ্রামবাসী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে। এই সাহায্যের জন্য তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আর যে-সব প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মালয়ে যত্নসহকারে পরিবারের মধ্যে আমায় একজন করে নিয়েছিলেন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা তাঁদের জানাই।

অনন্ত-নিবাস,
১৮।৩ রাজারাম দাস লেন,
কদমতলা, হাওড়া।

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

টপ সিক্রেট

আমরা তখন কল্যাণ ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করে স্থানান্তর গমনের হুকুমের প্রতীক্ষা করছিলাম। দেখতে দেখতে দুটি মাস কেটে গেল কিন্তু সামরিক বিভাগের কর্তাদের তরফ থেকে কোনো সাড়া শব্দই নেই। ওদিকে প্রাচ্য রণাঙ্গনে যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সে খবর আমাদের কাছে এসে পৌছেচে। একটা যে প্রলয়-ঝটিকা বইবে তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। দিন কয়েক পরেই সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম, আমেরিকার লেবরেটরী পরমাণু-বোমার ডিম্ব প্রসব করেছে, রাশিয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে। ওদিকে আবার আত্মসমর্পণের কথাবার্তাও নাকি চলছে।

একে একে আমাদের দল ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। এসব টপ সিক্রেট অর্থাৎ উচ্চতর মহলের গোপনীয় ব্যাপার তাই বন্ধুদের শুধু দল থেকে টপ্ টপ করে খসতেই দেখলাম। কি উদ্দেশ্যে কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কিছুই জানা সম্ভব হলো না। রোজই দেখি মেসের সিট দু-চারটে করে খালি হচ্ছে, বুঝতে পারলাম আমাদেরও তৈরী হয়ে থাকতে হবে, কেন না কোন মুহূর্তে যে সাগরপারের ডাক আমাদের কাছে এসে পৌছবে তার নিশ্চয়তা নেই। আমরা ৩৪নং ভারতীয় বাহিনীর অধীনে ছিলাম। আমাদের বাহিনীটি গঠিত হয়েছিলো আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করবার জন্যে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে সকলে ভয়ে ভয়ে আর দুর্ভাবনায় ছিলাম—তবে আত্মসমর্পণের কথা চলছে এই যা একটু সান্ত্বনা। কিন্তু জাপানী সহজে

ছাড়বার পাত্র নয় এটা জানা ছিল বলেই খুব যে ভরসা পাচ্ছিলাম তা নয়। ওদের মতিগতির কথা বদলাতে পারে, হয়ত আমাদের জাহাজের ওপরেই চড়াও হয়ে একবার মরণ-কামড় দেবার চেষ্টা করতে পারে।

আজ ৩০শে আগস্ট, সকালের দিকটায় বেশ বৃষ্টি শুরু হলো। লাল মাটির পথ কাদায় কাদাময় হয়ে গেছে। চাটুজ্যেমশায় এক জবর টপ সিক্রেটের হুকুমনামা নিয়ে এলেন। এটা হচ্ছে রাত চারটের সময় আমাদের এ ক্যাম্প থেকে খসবার আদেশপত্র। আমাদের গাড়ী সব জেমস্ সাইডিং থেকে যাবে, কল্যাণ স্টেশন দিয়ে আমাদের যাবার হুকুম নেই কারণ তখন প্লেগ কল্যাণে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, প্লেগের কল্যাণে দলে দলে লোকেরা মরছে।

রাত তুটোর সময় আমাদের জাগানো হলো, সে রাত্রে ঘুম হয়নি, আমরা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আমি বেশভূষা সমাপন করতে না করতেই চাটুজ্যেমশায় মেসে গিয়ে জলযোগ পর্যন্ত সেরে এলেন। তাঁর দৌলতে কিছু স্যাণ্ডউইচ পাওয়া গেল—ট্রেনে বসে যথাসময়ে এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাবে, এই ভেবে সেগুলো সযত্নে রেখে দিলাম। একটা সুরাহা তবু হলো, কেন না মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্বে কিছু যে পেটে পড়বে না এটা সুনিশ্চিত। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে তিন টনের লরীর ব্যবস্থা হয়েছিলো।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। যখন ট্রেনে এসে উঠলাম তখন দেখি জামাকাপড়গুলো সব ভিজে একসা হয়ে গেছে। গাড়ীতে গিয়ে দেখি সেখানে ন স্থানং তিলধারণং। বহু ভাগ্যবান আগেভাগেই এসে গোটা কামরাটি সব ভর্তি করে ফেলেছে। তাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আমিও ওপরের সিটে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর কিছুতেই চোখে আসে না। অদৃষ্ট

আমাদের কোন অজানা স্থানে নিয়ে চলেছে কে জানে, শুয়ে শুয়ে আমরা তাই গল্পগাছা জুড়ে দিলাম আমাদের গন্তব্য স্থান কোথায়। কেউ বলে বোর্নিও, কেউ বলে সুমাত্রা, কেউ বলে জাভা, কেউ বলে ইন্দোচীন—সেই ছিল আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। টপ সিক্রেটের কল্যাণে কারুরই কিছু জানবার উপায় নেই, তাই কতরকমের জল্পনা-কল্পনা যে চলছিল তার আর অন্ত নেই।

গাড়ী ছাড়লো পাঁচটার সময়। গাড়ী চলেছে বোম্বাইর দিকে ছ্যাকড়া গাড়ীর মত ছ্যাক্ ছ্যাক্ আওয়াজ করে। এদিকের সব ইঞ্জিনই বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে কিন্তু এটি হচ্ছে কয়লা-দ্বারা চালিত ইঞ্জিন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি, গাড়ীটা একটা স্টেশনে থামতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন সকাল আটটা। দেখি আমরা 'বালার্ড পায়ার' নামক একটি স্টেশনে এসে পৌছেচি—এটি সমুদ্রের কোল ঘেঁসে অবস্থিত। সমুদ্রের মধ্যে অনেক জাহাজ দেখতে পেলাম। স্টেশনটির সন্নিকটে একটা বিরাট শ্বেতকায় জাহাজ জলে ভাসছে, আশেপাশের কয়েকটি জাহাজে ট্যাঙ্ক ও ট্রাক তোলা রয়েছে দেখলাম। স্টেশনে ভারতীয় ও বৃটিশ সিপাহীদের জন্যে চায়ের স্টল আছে—এখানে কেনাবেচা হয় না, সৈন্যদের জন্যে সবই বিনামূল্যে খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা আছে। খরচটা সবই নির্বাহিত হয় যুদ্ধের তহবিল থেকে। পরিশ্রান্ত সিপাহীরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা ছড়িয়ে বসে পরম আরামে চা পান করছে। আমরা অফিসার, সুতরাং পদমর্যাদার খাতিরে ওদের কাছ থেকে তফাৎ আমাদের থাকতে হবেই শুধু পিস স্টেশনে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওসবের বালাই নেই, সেখানে মুড়ি-মুড়কির সব একদর।

সকল নটায় আমরা ট্রেন থেকে নামবার আদেশ পেলাম। ট্রেন

থেকে নেমে আমরা জাহাজের টিকিট নেবার জন্যে টিকিটঘরে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। একে একে সকলেই টিকিট পেলাম—সবই বিনামূল্যে। চাটুজ্যেমশায় ও আমাতে একটা কেবিন পেলাম। জাহাজের সামনেই মিলিটারী দাঁড়িয়ে রয়েছে—টিকিট দেখে তবে ভেতরে ঢোকবার অনুমতি দিলে। আমরা ভেতরে প্রবেশোদ্যত হলে সে বিনীতভাবে আমাদের জানিয়ে দিলে, আমরা যেন বাইরে বেরোবার মতলব না করি। কারণ তা নিষিদ্ধ। কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যতদিন না জাহাজ ছাড়ে ততদিন ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে বসে বসে কয়েদীর মত জীবনযাপন করতে হবে—ফাঁকে-ফুকরে আকাশ আর পৃথিবীর যে সামান্য অংশমাত্র দেখা যায় তাই দিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে। জাহাজের বাইরে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখি যে জাহাজের ছোট্ট ছোট্ট খোপের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে অনেকে আমাদের পানে তাকিয়ে মজা দেখছে। এদের অবস্থা দেখে করুণা হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো যে জাহাজে ঢোকবার পর আমাদের দেখেও বাইরের লোকেরা এমনি মজা পাবে। দুর্গানাম স্মরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। কোথায় যে যাচ্ছি, পাতালে না রসাতলে তা টের পাবার উপায় নেই—টপ সিক্রেটের পাল্লায় পড়েছি, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

জাহাজটার নাম 'নিয়া হেলাস', ১৭,০০০ টন মাল বহন করতে পারে। নামটা গ্রীক হলে কি হয়—কেউ বলে জাহাজটা স্কটল্যাণ্ডের, কেউ বলে যে গ্রীকদের হাত থেকে ইংরাজদের অধিকারে আসে গ্রীসদেশ জার্মানদের কবলিত হওয়ার প্রাক্কালে। তবে জাহাজের কর্মচারীরা সকলেই স্কচ্, বয় থেকে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত। জাহাজটি সাততলা—এ, বি, সি, ডি ও ই ডেক! 'এ' ডেকের ওপর 'প্রমেনেড' ডেক, তার

ওপর আর একটা ডেক্, সেটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি। নিচের 'ই' ডেকটি ভয়ানক গরম, সেটি গরীব যাত্রীদের জন্যে, যারা বেশি পয়সা দিতে পারে না। এখানে কিছুদিন থাকলে শরীরের রক্ত দূষিত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে বাইরের আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। দেয়ালে কতগুলো ছিদ্র আছে সেগুলোর ভেতর দিয়ে যন্ত্র-সাহায্যে বাইরের বাতাস ভেতরে আসে। জায়গায় জায়গায় দড়ির দোলনাগুলো ঝুলছে, তাতে যাত্রীদের শোবার ব্যবস্থা। ভারতীয় সিপাহীদের এই কেবিনে পোরা হয়েছে। সকলেই গরমে ছটফট করছে—এদের অবস্থা ঠিক খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত। যা লোক নেবার নিয়ম তার চেয়ে ঢের বেশি যাত্রী দিয়ে ডেকটি ভর্তি করা হয়েছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকায় আমি জাহাজের অফিসার কমাণ্ডিংকে জানিয়ে এর বিহিত করতে বলি। আমার কথা শুনে তাঁর করুণার উদ্রেক হলো বলে মনে হলো, কেন না তিনি ভারতীয় সিপাহীদের ডেকের ওপর এসে বিশ্রাম আর শোবার অনুমতি দিলেন। 'এ' ডেকটির নিচে গুদামঘর, আমাদের সমস্ত জিনিসপত্তর এই ঘরে রাখা হয়েছে। 'ডি' ডেকের একাংশ আমাদের মেস আর অন্য এক অংশ বৃটিশ সিপাহীদের খাবার আর থাকবার জায়গা। 'সি' ডেকে হাসপাতাল ও মেডিক্যাল ইন্সপেকসনের ঘর। হাসপাতালটি মন্দ নয়, এতে অনায়াসে পঞ্চাশ-ষাটজন রোগীর ঠাঁই হয়। এখানেও শাদা ও কালো চামড়ার প্রভেদ লক্ষণীয়, এতে ভারতীয় ও বৃটিশদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে থাকবার ব্যবস্থা। এই হাসপাতালে অনেককে সী-সিকনেসের জন্য ঢুকতে হয়েছিলো। জাহাজটায় এদিকটার এক কোণে হিন্দু সিপাহীদের রাঁধবার জন্যে রান্নাঘর, স্নানের ও পায়খানা-ঘর। সিঁড়ির সামনে চীফ্ স্টুয়ার্টের ঘর। সিঁড়িগুলো বেশ বড় বড় ও চওড়া চওড়া। তারও

ওপরে 'বি' ডেকের একদিকে অফিসারদের প্রথম শ্রেণী কেবিন আর একদিকে 'ভি. সি. ও' দের দ্বিতীয় শ্রেণী কেবিন। পাশেই পায়খানা ও স্নানের ঘর। 'বি' ডেকের ওপরে 'এ' ডেক, এখানেও 'বি' ডেকের মত সবকিছুই চোখে পড়লো তবে উপরন্তু একটি ক্যানটিন আছে। সর্বোপরি প্রমেনেড ডেক—এখানে প্রধান অফিস, সভাঘর, অফিসার কমাণ্ডিং-এর ঘর ও সিঁড়ির সামনেই দুটো প্রমোদ-কক্ষ। এ দুটো কক্ষে একটা করে পিয়ানো রয়েছে যার খুশি সেই বাজাতে পারে। সিনেমা দেখবার একটা করে বোর্ড আছে। একটি অফিসারদের ও অপরটি বৃটিশ ওয়ারেণ্ট অফিসারদের। ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের সিনেমা-ঘর বলতে কিছু নেই—তারা ওয়ারেণ্ট অফিসারদের ঘরে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারে। আমাদের প্রমোদ-কক্ষটি সবচেয়ে বড় ও দেখতে সুন্দর। দেওয়ালে সর্বত্র কাঠের ওপর বিচিত্র কারুকার্য। থামগুলো দামী শ্বেত-পাথরের। এখানে অনেকগুলো দেয়ালপাখাও আছে। টেবিল চেয়ার আর দামী দামী সোফায় ঘরটা ভর্তি, বাইরে থেকে ঘরে যাতে হাওয়া ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থাও আছে। এখানেই আমরা বেশির ভাগ সময় কাটাতাম হয় গল্পগাছা না হয় তাসপেটা আর দাবাখেলাতেই। অফিসারের সংখ্যা ছিলো প্রায় শ' আড়াই আর অন্যান্য লোকদের সংখ্যা ছিলো প্রায় চার হাজারেরও বেশি।

জাহাজে প্রথম যখন প্রবেশ করেছিলাম তখন 'সি' ডেকেই প্রবেশ করেছিলাম। এটি বেশ সুন্দর আলোবাতাসযুক্ত খোলা জায়গা। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম—সামনে 'বি' ডেকের ওপর এনকোয়ারী অফিস। এখানে জিজ্ঞাসা করাতে তারা আমাদের কেবিন দেখিয়ে দিলে—কেবিনের নম্বর ছিল নয় ও দশ। চাটুজ্যেমশায় ও আমি গিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লাম। বেশ ছোট্ট ঘর—ডান দিকে ওপরে ও

নিচে একটা করে স্প্রীংয়ের খাট রয়েছে। মাথার ওপর বিদ্যুতচালিত পাখা ও বিজলি বাতি। দেয়ালের গায়ে হাত-মুখ ধোবার 'বেসিন'। তাতে দুটো কল রয়েছে একটা গরম জলের ও অন্যটা ঠাণ্ডা জলের। বেসিনের ওপরেই কাঠের ছোট্ট একটা ব্রাকেট, তাতে দুটো কাঁচের গ্লাস আর জল রাখবার একটা কাঁচের পাত্র। বাঁদিকে কাপড় রাখবার বড় একটা আলমারি, সামনে আয়না-দেওয়া ড্রেসিং টেবিল। একদিকে জুতো রাখবার কাঠের একটা ছোট বাক্স। বিছানায় মোটা একটা গদি তার ওপরে ধবধবে সাদা একটা চাদর পাতা। বেয়ারা একটা করে বড় তোয়ালে দিয়ে গেল। বিছানায় একটা করে লাইফ বেল্ট পড়ে রয়েছে। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোবার জন্যে বেসিনের কাছে গিয়ে দেখি কলে জল একটুও নেই। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম এখানে জলও রেশনিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। তা তো হবেই, এই রেশনিংয়ের যুগে এটা আমাদের ভুললে তো চলবে না যে আমরা আর মাটির ওপর নেই জলের ওপর ভাসছি। সমুদ্রের জল পাওয়া যাবে কি না খোঁজ করলাম। তাও নেই, কারণ জল তুললে জাহাজের তেল জলের সঙ্গে উঠে আসবে। জাহাজ গতিশীল হলে জল পাওয়া যাবে। জাহাজ কবে ছাড়া হবে, তার গন্তব্যস্থল কোথায়, এ সব তথ্য কর্তাদের মধ্যে অনেকে জানেন কিন্তু কেউ তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না—কেন না এটা হচ্ছে টপ সিক্রেট।

এই টপ সিক্রেটের ধাক্কার ঠেলায় আসামের লামডিং থেকে একেবারে সরাসরি কল্যাণে এসে পড়েছিলাম। এখানে আটক থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। জাহাজে উঠে ভেবেছিলাম এবার সোয়াস্তি পাওয়া যাবে। কোথায় স্বস্তি, এ যে আর এক ফ্যাসাদ। একে তো টপ সিক্রেটের ধাক্কা সামলাতেই প্রাণান্ত, তার ওপর আবার 'এ্যাটেনশানের' জবরদস্তি।

জাহাজের সর্বত্রই একটা করে লাউড-স্পীকার বসিয়ে রাখা হয়েছে। ওপরের বড় অফিস থেকে কোন হুকুম দিলে কিংবা কোন কথা বললে সেটা জাহাজের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ গুরুগম্ভীর স্বর দেয়াল ফুঁড়ে ধ্বনিত হলো—'শুনুন মশায়, শুনুন, ইউনিটের অফিসার কমাণ্ডিংরা এখনি বড় অফিসে দয়া করে দেখা করুন।' চাটুজ্যেমশায় বেচারা জামা-কাপড় খুলে একটু আরাম নিচ্ছিলেন, ছুটলেন বড় অফিসে রিপোর্ট করতে। খানিক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লেন—'কেলেঙ্কারী মশায়, কেলেঙ্কারী! দেখুন ব্যাটারা আবার কি দিয়েছে।' খুলে দেখি একটা টপ সিক্রেট। টপ সিক্রেটের বাণ্ডিলটা রেখে দিয়ে জলের সন্ধান করলাম। বোতলে কিছু জল ছিল, তাই দিয়ে কোনমতে মুখ আর মাথাটা ধুয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিলাম। আমাদের কক্ষটা একটা চোর-কুঠরীবিশেষ, বাইরের একটুও হাওয়া পাওয়া যায় না। আলো না জ্বাললে দিনের বেলায়ও অন্ধকার। পাখা চালিয়ে আর আলো জ্বালিয়ে একটু আরাম পেলাম। আবার এ্যাটেন-শানের পালা, 'লাঞ্চ' নাকি প্রস্তুত। জামা-কাপড় এঁটে সেই গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়লাম—উদর-নামক বৃহৎ গহ্বর পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে। বেয়ারা 'সি' ডেকের' নিচে ভোজন-কক্ষটি দেখিয়ে দিলে। এখানে ছোট ছোট গোল-মত কতকগুলো জানলা আছে, তাই দিয়ে বাইরের আলোহাওয়া রীতিমত ভেতরে আসে। আমাদের বেয়ারাটি বেশ মোটাসোটা আর হাবাগোবা চেহারা। আমি তার নামকরণ করলাম 'হোদল কুতকুত'। সে বেচারা এর তাৎপর্য না বুঝে আমাদের দিকে শুধু চোখ পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসত। মধ্যাহ্ন-ভোজনে যা দেয় তার সবই হিন্দুর অখাদ্য—এতে পেটের এককোণও ভরে না। নিরুপায় হয়ে পেটের ক্ষিদে নিয়েই উঠতে হয়। চাটুজ্যেমশায় পর্ক খান, মাঝে মাঝে

তাই মাংসের আস্বাদটুকু পান। ভাত মোটেই হয় না। কেবল রুটি আর মাখনের ছড়াছড়ি।

ভারতীয়দের খাদ্যসমস্যা নিয়ে কল্যাণে এক শ্বেতাঙ্গ মেসে অফিসারের সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়। আমি তাকে বলি যে যুদ্ধে এসেছি বলে আমরা রুচিবিরুদ্ধ যা তা খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারি না। শ্বেতাঙ্গ অফিসারটি আমার কথা শুনে আর উচ্চবাচ্য করেনি। একটা ইউনিটে যদি বেশির ভাগ শ্বেতাঙ্গ অফিসার থাকে তা হলে তাদের মতেই খাদ্যের মেনু তৈরী হয়। ভারতীয় অফিসারদের রুচির কথা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। জাহাজে খাবার সময় প্রথমে দু-একদিন যে যেখানে পারে ছুটে গিয়ে আসন গ্রহণ করতে হতো, কেন না তখন আসন গ্রহণ করতে না পারলে আবার এক ঘণ্টা পরে খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে। কয়েকদিন পরে কিন্তু বেশ চমৎকার ব্যবস্থা হলো। সব অফিসারদের খাওয়ার দুটো সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। প্রথম বারে আমরা দুজনে এক টেবিলেই বসতাম—বসবার চেয়ারের নম্বর দেওয়া ছিল। সময় বারোটা থেকে একটা। দ্বিতীয় বারে ভোজনের সময় ছিল একটা থেকে দুটো পর্যন্ত। খাবার যা দেয় তাতে দেহপুষ্টির উপাদান ষোল আনাই ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এগুলোতে পূর্ণবয়স্কের উপযোগী পূর্ণমাত্রায় ক্যালোরির মূল্য বিদ্যমান, কিন্তু সবই 'ইংলিশ ফুড'। সত্য কথা বলতে এ সমস্ত বিজাতীয় খাদ্য আমাদের ভারতীয় রসনার পক্ষে আদৌ রুচিকর নয়। আমরা বাল্যাবধি মা-বোনদের হাতের মুখরোচক রান্না খেতে অভ্যস্ত, এ সমস্ত অখাদ্য যেন গলা দিয়ে নামতেই চায় না। চাটুজ্যেমশায়ের নিকট এদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতেই তিনি বলে উঠলেন—'হ্যাৎ তেরি মশাই, আপনার ক্যালোরির নিকুচি করেছে। এ ম্লেচ্ছের খাদ্য কি বামুনের রোচে!'

সকাল ছ'টাতেই 'হোদল কুতকুতের' কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙলো—'হাফ পাস্‌ট্‌ সিক্স, ওয়াটার ইজ ইন।' বিরক্ত হলাম, কিন্তু উপায় নেই উঠতেই হবে, তা না হলে প্রাতরাশটা মাঠে মারা যাবে। কলের জল পাওয়া যায় সকাল ছটা থেকে সাতটা, আর পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত। যখনই জল আসে আমাদের দুটো বোতলে, একটা কাঁচের পাত্রে আর দুটো গেলাসে ভর্তি করে রেখে দিই। তা না হলে বাস্তবিকই বলতে হবে—'ওয়াটার, ওয়াটার অন অল সাইডস, বাট নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।' জলে বাস করে জলের এত কষ্ট, অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে! ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে লাউড স্পীকারের সেই বিরক্তিকর আওয়াজ মাঝে মাঝে শুনতে পাই।

দশটা বাজবার পরেই আমাদের কেবিনে থাকা নিষিদ্ধ এ্যাটেনশান তা জানিয়ে দেয়। এ সময়টা জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদের সকলের ঘর পরিদর্শন করতে বের হন। পরিদর্শনের পর আমরা যে যার নির্দিষ্ট স্থানে যেতে পারি। সেটাও এ্যাটেনশান আবার জানিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেনকে দেখলেই মনে হয় বিশ্বের সকল দুশ্চিন্তার ছাপ যেন তার মুখে বিদ্যমান। ভুরু সব সময় কুঁচকেই আছে। বাবাজী হাসছেন না কাঁদছেন, চাটুজ্যে-মশায়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, বাবাজীর বদনই এ রকম।

সেদিন আমি আমার কেবিনে একলা বসে আছি এমন সময় এ্যাটেনশান চেঁচিয়ে একজন মিসিবাবাকে বড় অফিসে দেখা করতে বললেন। মিসিবাবার নাম শুনতেই পাশের ঘরে সাহেবদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। মরুভূমিতে একটু জলের সন্ধান যেন সবাই পেলে। চাটুজ্যেমশাই বড় অফিসেই ছিলেন, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লেন যে রেডক্রশের একটি মিসিবাবা দর্শন দিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্ণনা করলেন। দেখতে খুব রোগা, মুখ দেখলে মনে হয় প্রৌঢ়ত্বের সীমানা

তিনি ছাড়িয়ে গেছেন। বাইরে এসে মিসিবাবাকে দেখবার জন্যে সকলের সে কি প্রবল আগ্রহ! মিস্ নামটায় সত্যই একটু চার্ম আছে, ছোট থেকে বুড়ো সকলেরই বুকটা একটু ছাঁৎ করে ওঠে। আমিও তাঁকে দেখবার সুযোগ পেলাম। সামনের দাঁত দুটো একটু সোনাদিয়ে বাঁধানো, ঠোঁটে লিপষ্টিক। খানিক পরে বাতাসে খবর এল এই তিনকাল-উত্তীর্ণা মিসিবাবার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে নাকি ডুয়েল ফাইট্ হবার জোগাড় হয়েছে।

জাহাজের নিয়ম হচ্ছে সকলকেই লাইফবেল্ট নিয়ে ঘুরতে হবে। দুটো ছোট ছোট বালিস মাঝখানটায় কাপড় দিয়ে জোড়া আছে, আর সেই মাঝখানটায় একটা প্রকাণ্ড ফুটো দিয়ে মাথাটা গলিয়ে পাশের দড়ি এঁটে সেটা পরতে হয়। সকলে এটি পরে জাহাজের ডেকে 'লাইফ বেল্ট প্যারেড'-এর কথা আমাদের জানানো হলো। সময় সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। যথাসময়ে সিপাহী থেকে কর্নেল পর্যন্ত সবাইকে সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়। সকলেরই সামনে একটা বালিশ পেছনে একটা বালিশ। রৌদ্রে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে 'ষ্ট্যাণ্ড এ্যাট ইজ্' হয়ে। দূর থেকে আই. ও. আর. আর বি. ও. আর.-দের এ্যাটেনশান শুনতে পাওয়া যায়। পরে শেষ মুহূর্তে—ক্যাপ্টেন আমাদের কাছে এসে একটু ঘুরে ফিরে বালিশ দুটো ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে চলে যান। ওপরের ডেকে দু'হাজারের বেশি লোক দাঁড়িয়ে, সকলেরই সামনে বালিশ ও পেছনে বালিশ। ওপরের পরিদর্শন শেষ হয়ে গেলে ক্যাপ্টেন নিচে চলে যান। ঘণ্টাখানেক পরে আবার লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল, এবার ডেক খালি করতে হবে। এই আদেশটুকু শোনবার জন্যেই এতক্ষণ হাঁ করে থাকতে হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই একটু বিছানা নিতে হয়। বিছানায় শুয়ে

শুয়ে একটু মেডিক্যাল বই পড়তাম না হয় ঘুমুতাম। তিন-চারটেয় ঘুম থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে নিতাম। তারপর ধড়াচূড়া বেঁধে রিক্রিয়েশান রুমে গিয়ে বসতাম। আমাদের একটা বদনাম আছে যে আমাদের মত সাহেবরা দিনের বেলা নিদ্রা যায় না। কিন্তু এটা সত্যি নয়, কেন না আহারের পরেই যে যার নিজের বিছানায় গিয়ে নাগা-সন্ন্যাসী সেজে চোখ বোজে, আবার বেলা চারটায় আমাদের মতই চোখ খোলে।

জাহাজে খেলাধুলার সোরগোল আর এ্যাটেনশানের আওয়াজ এখন সয়ে গেছে। প্রায় দিনে পাঁচ-ছয়শো বার এ্যাটেনশানের ধ্বনি কানে প্রবেশ করে। সেদিন বিকালে বড় অফিসে আর একজন মিসিবাবার ডাক পড়লো। তখন প্রমোদ-কক্ষে বসে ছিলাম—বড় অফিস আমাদের পাশের ঘরেই। এ পথ দিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। সোরগোলটা মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। শ্রীমতী ভেতরে ঢুকলেন একাকিনী বিজয়িনীর মত—হাতে একটা ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগ। অস্বাভাবিক দীর্ঘাঙ্গিনী, উচ্চতা আন্দাজ প্রায় ছয় ফিট তিন ইঞ্চি। দোহারা চেহারা—যৌবনের সীমানা ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় এসে পৌছেছেন। ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো লিপস্টিকের জৌলুসে পাকা লঙ্কার মত রাঙিয়ে তুলেছেন—লাল গালে একটু রুজ—গোলাপী আভা ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনও করেছেন। চোখ দুটো বেশ বড় বড় টানাটানা—মাথায় বব করা চুল। চাটুজ্যেমশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কিন্তু তার লোমশ হস্ত দুটি দেখবামাত্র তিনি তাঁকে ডিসকার্ড করলেন। আমাদের পাশে ছিল এক 'টুনটুনি', বেচারা ভাবাবেগে আমাকে জড়িয়েই একেবারে চিৎপাৎ। তার মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে চাটুজ্যেমশায় বললেন, বেটা চিদানন্দ। ভদ্রলোকটির নাম ছিল আনটোনি—ছোটখাটো মানুষটি আর তার

বয়স কম দেখে—আমি তার নাম দিয়েছিলাম 'টুনটুনি'। পাশের সহযাত্রীদের 'দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ কানে এল। তাস-পাশা সব পড়ে রইলো। মিসিবাবা বাইরের ঘরে এসে বসলেন। তিনি নিজের কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মুখ তোলেন আবার নিজের কাজ করে যান। দেখতে-দেখতে সবাই তার চার পাশে এসে জুটলো। হঠাৎ একটা ইউনিটের এক মেজর নিজে এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালেন। চাকা ঘুরে গেল। আবার শুরু হলো তাসের নোট্রাম্প আর থ্রিস্পেডের ডাক। 'সেকস্যুয়াল পারভারসান'-এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত এবার প্রত্যক্ষ করা গেল। নারী-সঙ্গবর্জিত মানুষের মনের গতি বাস্তবিকই বিচিত্র হয়ে দাঁড়ায়।

জাহাজ একটু সরে বন্দর থেকে দূরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এখন স্নানের জল বেশ পাওয়া যাচ্ছে। দুদিন স্নান করবার সুযোগ পাইনি—আজ একটু মাথায় জল দেওয়া চাই-ই। বিকাল ছটায় দশ মিনিটের মধ্যে কাকস্নান করে খেতে গেলাম। খাওয়ার পর দুটো কাজ হয়—'এ' ডেকে বেড়ানো আর না হয়—সহযাত্রীদের হাহুতাশ শোনা। সাতটার পর থেকে প্রমোদকক্ষটি একেবারে ফাঁকা, এখন ডিনারের সময় আর তা ছাড়া সকলে ডেকের বাইরে গিয়ে হাওয়া খায় এই সময়।

আজ ১লা সেপ্টেম্বর জাহাজ ছাড়বার নাম নেই। রাত্রে যে যার বিছানা নিলে। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল যে জাহাজটা দুলছে। চাটুজ্যেমশায়ও উঠেছেন। এমন আলসেমিতে পেয়েছে যে, জাহাজডুবি হলেও 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। বিছানায় শুয়ে শুয়েই দুজনে আলাপ করছি। কেবলই মনে হতে লাগলো সত্যই কি দেশ-মাতৃকার কোল ছেড়ে এবার অকূল-দরিয়ায় ভাসলাম! নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে যে এত কষ্ট তা কে জানতো!

সকাল হতেই মিঃ হোদল কুতকুতের সেই মধুর কণ্ঠে "ওয়াটার ইজ ইন"—উঠতেই হল! দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাই, চলতে গেলে টলতে হয়। জাহাজ বেজায় দুলছে। মুখ হাত ধুয়ে বাইরে গিয়ে দেখি জাহাজ তীর থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। শরীরটা আজ মোটেই ভাল লাগছে না, মাথাটা বিষম ঘুরছে। চলাফেরা করবার ইচ্ছা হয় না, শুধু নট্‌-নড়ন-চড়ন হয়ে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে। হোদল কুতকুত আমাদের ওপরের ডেকে গিয়ে হাওয়া খেতে বললে—নাহলে নাকি 'সী-সিকনেস' হবার আশঙ্কা আছে। তার পরামর্শ মত ডেকে গেলাম। কেবিনে শুয়ে মনে হয়েছিল সমুদ্রে ঝড় উঠেছে কিন্তু ওপরে গিয়ে দেখি সমুদ্র বেশ শান্ত। জাহাজ চলেছে ঢেউয়ের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে। সাদা ফেনা নীল জলের সঙ্গে মিশে ঈষৎ সবুজ আভা বেরুচ্ছে। ওপরে নীল আকাশ ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড মেঘগুলোকে যেন মায়ের মত স্নেহাঞ্চলে ঢেকে রেখেছে। নিচে সমুদ্রের নীলাম্বুরাশির অনন্ত প্রসার। ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পশ্চাতে দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয় না। চতুষ্পার্শ্বে আকাশ যেন গভীর স্নেহে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমাদের জাহাজটাকে ঘিরে আরও সাত আটটা সৈন্যবোঝাই জাহাজ চলেছে। সমুখে সমুদ্রের বারিরাশি যেখানে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে সেখানে একটা সাবমেরিন-ডেষ্ট্রয়ার চলেছে বৃটিশের বিজয় পতাকা উড়িয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে। আশে পাশের কতকগুলো উড়ন্ত মাছ ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে—দেখে খুব আনন্দ পেলাম। আমাদের জাহাজ এখন আরব সাগরের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

সকাল বেলায় মিসিবাবা দুজনে জড়াজড়ি করে পায়চারি করেন, পেট ভরে হাওয়া খান, কিন্তু দুজোড়া বালিশ নিয়ে আমাদের মত তাঁদের

ঘুরতে হয়। আমরা এসময়টা সাধারণত বসে বসে গল্প করি আবার কখনও জাহাজের কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করি। তাঁরা কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—সমান তালে প্যারেড করেই চলেছেন। জাহাজে আমার একজন ইংরাজ বন্ধু ছিলেন, ভদ্রলোক মেজর,-বেজায় রসিক। মিসিবাবাদের প্যারেডের সঙ্গে তাল রেখে র্নির্বিকার ভাবে লেফ্ট রাইট্ বলতে থাকেন। আচমকা পুরুষ কণ্ঠে লেফ্ট রাইট্ শুনে মিসিবাবাদের প্যারেডের তাল কেটে যায়—প্যারেড বন্ধ রেখে এদিকে ওদিক ফিরে তাকান, আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিক্ করে হেসে ওঠেন। ক্রমে ঐ ডেকের ওপর শ্রীমতীদ্বয়ের দর্শনার্থীদের ভীড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। বাথরুমের সামনেও বেজায় ভীড় হয়। আমি একটু সকাল সকালই স্নান সেরে নিতাম নইলে দেবতার দ্বারের মত হত্যে দিতে হতো। স্নানের ঘরের বাথ-টাবটা খুব বড় ছিল, আমি তাতে শুয়েই চান করতাম। ঠাণ্ডা ও গরম জল দুটোই পাওয়া যেত—দুটো কল থেকে স্নান করবার পর চুলগুলো নোনাজলে একেবারে আটার মত মাথায় লেপ্টে থাকতো। স্নানান্তে ক্যান্টিন গিয়ে হাজির হতাম। সেখান থেকে কিছু চকোলেট আর সুইটস্ কিনে নিতাম। শুনেছিলাম সুইটস্ খেলে সী-সিকনেস হয় না।

এ্যাটেনশান আজ বলে দিয়েছে যে আমাদের প্রমোদকক্ষে সিনেমা দেখানো হবে। এই 'শো'টা সব অফিসারদের জন্যে। সবাই লাইফ-বেল্টদুটো এক একটা সিটে রেখে সিট রিজার্ভ করে এলাম। চাটুজ্যে-মশায় সন্ধ্যার সময় কোথাও যান না, নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যাহ্নিক করেন, জাহাজে এসেও এটা ছাড়তে পারেননি। হাজার হক সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলে ত! সন্ধ্যাহ্নিক কালে ব্রাহ্মণ সন্তানদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে

হয়। ভদ্রলোক কিন্তু যে ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ত্রী দেবীর নামোচ্চারণ করেন তাতে মনে হয় তিনি দেবীর একজন পরম ভক্ত। এমন কি দেবীর সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন পত্রালাপও চলে। বাস্তবিক পত্নী গায়ত্রী দেবীকে রোজই পত্র লেখেন বলে ভদ্রলোকের স্ত্রীভক্ত আখ্যা লাভ হয়েছে। জাহাজ চলেছে অবিরাম—চাটুজ্যেমশায়ের ভাবনারও আর শেষ নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মুদিতনেত্রে সম্ভবত গায়ত্রী দেবীরই ধ্যান করেন। জাহাজ যতই এগিয়ে চলেছে তাঁরও হা-হুতাশ ততই বাড়ছে। ভদ্রলোক আমাকে সব কথাই খুলে বলেন। পত্নীবিরহ-কাতর ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়। সমবেদনার স্পর্শে তাঁর মনের রুদ্ধ কপাট খুলে যায়, পত্নীর কথা বলতে বলতে তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

ডিনারের পর আমরা আমাদের রিজার্ভ করা সিটে গিয়ে বসলাম। নিজ নিজ আসনে সুখাসীন হয়েই দেখি মিসিবাবারা পূর্ব থেকেই সামনের সিটে বসে আছেন। সেখানে ইতিমধ্যেই 'মধুমত্তভৃঙ্গসম' ভক্তমণ্ডলী জুটে গেছে। ভাগ্যবান দু' একজন তাঁরা তাঁদের পাশে বসবার অধিকার লাভ করেছেন, বাদবাকী সকলে শ্রীমতীদের পদতলে স্থান লাভ করেই সার্থক মনে করেছেন। ত্রিকালোত্তীর্ণা মিসিবাবা পুরানো মেজরকে বাতিল করে নতুন আর একটি মেজরের সঙ্গে রঙ্গরস জুড়ে দিয়েছেন। পুরনো পাপী মেজরটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখছে আর মাঝে মাঝে এদের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। জাহাজে এদের প্রেমের এই টাগ-অব-ওয়ার নিয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো, এমন কি এদের নিয়ে মেজরদের মধ্যে ডুয়েল ফাইটের পূর্বাভাস দেখে বেয়ারারা পর্যন্ত যে বেশ কৌতুক বোধ করছিল তা তাদের চোখ মুখের ভাব দেখেই বোঝা গেল। সেদিনের সিনেমায় দেখানো হলো 'ওয়ান্

রুম ওনলি’ বলে একটা চমৎকার হাসির ছবি, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে যায়।

সিনেমার পর বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে কেবিনে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। এমনিভাবে সমুদ্রবক্ষে কাটলো চার দিন।

জাহাজ দিনরাত অবিশ্রান্ত চলেছে, কোথাও থামবার নামগন্ধ নেই। সকালে শুনলাম যে এবার আমরা আরব সমুদ্র ছেড়ে ভারত মহাসাগরে এসে পড়বো। সকলের একান্ত আগ্রহ জাহাজটা যদি কিছুক্ষণের জন্যেও একবার সিংহলে দাঁড়ায়। কিন্তু সিংহলে নোঙ্গর করা তো দূরের কথা, লঙ্কা দ্বীপ বিশ মাইল ব্যবধানে রেখে আমাদের জাহাজ গন্তব্যস্থল অভিমুখে এগুতে লাগলো। এবার আমরা ভারত মহাসাগরে এসে পড়লাম। মহাসাগর দেখলাম—অপূর্ব সুন্দর মহান্ বিরাট দৃশ্য। মাথার উপর নিঃসীম মহাকাশ, নিম্নে অনন্ত প্রসারিত নীলাম্বুধি! মন টেনে নিয়ে গেল অসীমের পদপ্রান্তে। মনে করেছিলাম হরেকরকমের সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে পাবো কিন্তু এক উড়ন্ত মাছ ছাড়া আর কোনো সামুদ্রিক প্রাণী চোখে পড়েনি।

জাহাজে বোম্বে ফিল্মের দুখানা হিন্দি বই আই. ও. আর.দের দেখানো হলো। মালাক্কা প্রণালীর মুখে জাহাজে মাইন ক্লিনার জুড়ে দিলে। দুটো মোটা তার দুপাশ থেকে জল কাটতে কাটতে চল্‌ল। কিছুদূর আসবার পর আমার এক ইংরাজ সহযাত্রী দূর দিগন্তের কাছে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সুমাত্রা দ্বীপ দেখালেন। আমার কেমন সন্দেহ হল কিন্তু কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল তার সুমাত্রা দ্বীপ ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ক্রমশ নির্মল হয়ে উঠলো। সুমাত্রা এখান থেকে দেখা অসম্ভব। জাহাজ এখানে এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ফায়ার করলো। গুলির

পর গুলি চলেছে, আকাশের গায়ে মিশে সাগরের বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে সুমাত্রা দ্বীপে প্রাচ্যরণাঙ্গনে জাপানের সব চেয়ে বড় নৌঘাঁটি ছিল। জাহাজ ছাড়বার আগেই একথা কর্তারা আমাদের জানিয়ে দিলেন যে মালয়ে আমাদের পোর্ট ডিকসনে-এ নামতে হবে।

এগার তারিখের সকালবেলায় দূরে ছোট ছোট পাহাড় নজরে পড়তে লাগলো। জাহাজের একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছিলো না। দিনরাত সারাক্ষণ শুধু জল দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। যদি চুপ করে শুয়ে বসে কাটানো যেত, তা হলেও কতকটা বাঁচোয়া ছিল। কিন্তু তা নয় লাইফ-বেল্ট প্যারেড আর এ্যাটেনশানের ধাক্কার ঠেলায় প্রাণ অস্থির। দু'একদিন যাবৎ আর এক উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, ব্যাপারটা অনেকটা সার্কাসের কসরৎ দেখানোর মত। পিঠে ঝোল্না বেঁধে দড়ি বেয়ে আমাদের তিনতলা থেকে নিচের তলায় নামতে হতো। কোথায় যুদ্ধবিরতি আর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, ভাবলাম পৈতৃক প্রাণটা এবার বাঁচলো। তা নয়, এদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে এরা আমাদের পঙ্গু বানিয়ে ছেড়ে দেবার মতলবে আছে। আমাদের সেদিন দড়ি বেয়ে নিম্নাবতরণের পালা, থলের মধ্যে দুখানা কম্বল পুরে পিঠে বেঁধে নিলাম। বোঝাটা একটু ভারীই হয়েছে মনে হলো। ইউনিটের লোকগুলো সব একে একে নেমে গেল, এবার আমার পালা। বাদুড়ের মত দড়ি আঁকড়ে ধরে নিচের পানে তাকালাম তখন বেশ একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। একবার ভাবলাম এই নিম্নাবতরণ-পর্বটা সংক্ষেপে সেরে নিই, অর্থাৎ দড়িটা গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়ে এদের ডিসিপ্লিনের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করি। যাই হোক পতন হলেও অপঘাত যাতে

না হয় সে ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। অবশেষে বহু আয়াসে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল—বহাল-তবিয়তেই নিচে নেমে এলাম। নিচে দুজন লোক উর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদি পড়ে যাই তাহলে লুফে নেবে তাদের ওপর এই হুকুম। চাটুজ্যেমশায় আমার পরেই নামলেন। মধ্যাহ্নভোজনের সময় রোজ বিলিতী খানা খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জাহাজের 'চীফ ষ্টুয়ার্টের' সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছিলাম; তার কল্যাণে মাঝে মাঝে চাট্টি ভাত একটু তরকারী পেটে পড়তো। আমাদের এক টেবিলে খেতে বসতেন একজন স্কচ; গোমাংসের উপর ছিল ভদ্রলোকের উৎকট আসক্তি। গোমাংস পাতে না পড়লে ভদ্রলোকের খাওয়াটাই সেদিন মাটি হতো। স্কচরা সব সময় অন্যজাতের লোকের নিকট ইংরেজদের খাটো করবার চেষ্টা করে। ইংরেজরাও সুযোগ পেলে অন্যদেশীয়ের নিকট স্কচদের হেয় প্রমাণ করবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। এর মূলে কোন কমপ্লেক্স বিদ্যমান তা কে জানে! আমাদের সহযাত্রী স্কচ-ভদ্রলোকও তাঁর স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় লণ্ডন যে অত্যন্ত বাজে জায়গা সে কথাই বারবার করে বলতে লাগলেন।

সেদিন ডেকে এক শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর সঙ্গে আমার বেশ প্রচণ্ডরকমের বাক্যযুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমরা নাকি শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবো না, কারণ আমাদের মাথায় নাকি রাজনীতি ঢোকে না, কাজেই ইংরাজ যদিই-বা আমাদের স্বাধীনতা দেয়, তাহলে তা রক্ষা করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না। তারপর তিনি বৃটিশ সৈন্যদের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে তাঁরাই নাকি দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা, ভারতীয় সৈন্যরা ত তাঁদের তুলনায় নেহাতই ছেলেমানুষ। ভদ্রলোকের কথাগুলো

শুনে এবং তাঁর বলার ভঙ্গী দেখে পিত্ত জ্বলে উঠলো। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলাম, "আপনাদের কূট-রাজনীতি আমাদের মাথায় ঢোকে না বটে কিন্তু দেশশাসনের যোগ্যতা যে আমাদের আছে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর দ্বারা তা কি প্রমাণিত হয়নি? আর সৈন্যদের বীরত্বের কথা যদি তুললেন ত জিজ্ঞাসা করি, 'ইম্ফল-অবরোধের' সময় কারা প্রাণ দিয়ে জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমাদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলো সেদিন? ঐ ছেলেমানুষ ভারতীয় সৈনিকেরাই নয়কি? কিন্তু তারা পরাধীন দেশের লোক তাই তাদের নাম সংবাদপত্রে মুদ্রিত হলো না—তার পরিবর্তে ফলাও করে জাপ বিতাড়নে বৃটিশবাহিনীর বীরত্বকাহিনীই সর্বত্র বিঘোষিত হলো। এমন কি সিনেমা শো'তে 'বর্মা ভিক্‌ট্রি' নাম দিয়ে তাদের নিজেদের নাম জাহির করলে। ভিক্টোরিয়া ক্রশ, সর্বোচ্চ সম্মানযুক্ত পুরস্কার, বেশির ভাগ পেয়েছে ভারতীয় সৈনিকেরাই তাদের বীরত্বের ও সাহসের জন্যে। ভারত যদি কখনও স্বাধীন হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতেই তা হবে, তাহলে দেশশাসন-কার্য সুষ্ঠুভাবেই চলবে। আমাদের নেতারা কোন অংশেই আপনাদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে হীন নন।" ভদ্রলোকটি তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা তুললেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলন নাকি কোনদিনই হতে পারবে না। আমি জবাব দিলাম, "একথা বলতে আপনারই লজ্জিত হওয়া উচিত, কেন না উভয় সম্প্রদায়ের এ ভেদবুদ্ধি আপনাদেরই সৃষ্টি। আপনাদের আগমনের পূর্বে প্রায় সাতশো বছর হিন্দু-মুসলমান আমরা মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করেছি। কিন্তু আজ আপনারা আপনাদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে ভায়ের বিরুদ্ধে ভাইকে উস্কে দিচ্ছেন। আমাদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ হয়ত ভবিষ্যতেও হবে: কিন্তু দেশ স্বাধীন

হলে তার মীমাংসার জন্যে আমরা আপনাদের ডাকতে যাবো না। তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস ভবিষ্যতে যদি কোন বিদেশী কোনদিন আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান এক হয়েই তাদের প্রতিরোধ করবো।" চীনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। সেখানেও দুটো দল আছে, একটা কম্যুনিষ্ট পার্টির দল আর একটা জেনারেল চিয়াং কাইসেকের দল। দুই দলের মধ্যে যেন সাপ-নেউলের সম্বন্ধ। কিন্তু জাপান যখন তাদের ওপর চড়াও হলো তখন দু'দল সমবেতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করলো। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মুসলিম লীগের মোহ থেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় একদিন মুক্ত হবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি সেদিন ভারতবর্ষকে চরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর একদিন আর এক শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় সংগীত নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো। 'ভার্ডিক্ট অন ইণ্ডিয়া'-এর লেখক বিভার্লি নিকল্‌স্ যেমন এখানে কিছুদিন থেকেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন দার্জিলিংএর সন্নিকট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, একথা লিখে ভারতবর্ষের ভূগোল-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন; এই ভদ্রলোকটিরও ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি প্রায় সেই ধরনের। ভাবখানা এই যেন মাত্র এক বৎসর ভারতবর্ষে থেকেই তিনি ভারতীয় সংগীতের সবকিছু জেনে ফেলেছেন। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করবার তিনি শ্রেষ্ঠ অধিকারী বটে! বল্লাম, আরাকানে তিনি যা শুনেছেন তা হচ্ছে অরণ্য-সংগীত, তার থেকে ভারতীয় সংগীত-সম্বন্ধে ধারণা করা আর লণ্ডন চিড়িয়াখানায় গিয়ে প্রাণী-বিশেষের সংগীত শুনে বিলাতী সংগীত-সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করা প্রায় সমান।

জাহাজ এখন বেশ আস্তে আস্তে চলেছে। ডেকের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হবার পর এই প্রথম জঙ্গলাকীর্ণ সমুদ্রবেলা দৃশ্যমান হলো। দূর থেকে জঙ্গলই শুধু নজরে পড়লো, বাড়িঘরের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। নাবিকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে আমরা সোয়েটেনহ্যাম বন্দরের কাছে এসে পড়েছি। এখানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করলো। যাদের এখানে নাবার কথা তাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। সকলেই পিঠে ঝোলা বেঁধে এ্যাটেনশানের আদেশের প্রতীক্ষায় হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। এমনি করে তাদের পুরো দুটি দিন কাটলো, নামা হলো না। দুদিনের পরের দিন ভোর পাঁচটায় তাদের অবতরণ করতে হবে এ্যাটেনশানে একথা তাদের জানানো হলো। সকলে একে একে বিদায় নিলে। মিসিবাবারাও অবতরণ-স্থানে হাজির হলেন, সহাস্যে করমর্দন করে মেজরদ্বয় ও ভক্তমণ্ডলীকে বিদায় দিলেন। তাঁরা যাবেন সিঙ্গাপুরে, দুজনেই রেডক্রশে কাজ করেন।

সকলে একে একে সিঁড়ি বেয়ে বড় মোটর-বোটে নেমে গেল। পোর্ট সোয়েটেনহ্যাম এখান থেকে ষোল মাইল হবে। সেদিন জাহাজ ওখানেই নোঙ্গর করে থেকে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে দেখি জাহাজ বেশ চলছে। ঘণ্টাদুই পরে আমরা পোর্ট ডিক্‌সনে এসে পড়লাম। আমাদের জাহাজ ঘাট থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা পিঠে ঝোলা ও 'ওয়ার বট্‌ল্' বেঁধে বড় মোটর-বোটে আস্তে আস্তে পোর্ট ডিক্‌সনে এসে নামলাম। মিলিটারী পুলিস এখানে পাহারা দিচ্ছে। এখানে একটা অস্থায়ী বন্দর স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরের কাছে ছোট একটা রেল স্টেশন—মিটারগেজ রেললাইন রয়েছে। শুধু দুটো মালগাড়ি, ইঞ্জিন ও

যাত্রীবাহী ট্রেনের চিহ্ন দেখলাম না। শুনলাম বৃটিশরা পরাজিত হয়ে মালয় ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন ও ভাল ভাল যাত্রীবাহী কামরাগুলো মালয় প্রণালীর গর্ভে নিক্ষেপ করে। সৈন্যবিভাগের লোক ছাড়া অন্য লোকজন নজরে পড়লো না। পাশেই প্রণালীর ওপর কতকগুলো বড় বড় নতুন ও পুরাতন নৌকা ভাসছে। শুনলাম এটাই ছিল জাপানীদের জাহাজ-ঘাঁটি। খানিকদূর এগিয়ে সামনেই বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। দুপাশে ইট-কাঠে তৈরী ছোট বড় বাড়ি। নিচের তলায় চীনাদের দোকান, সবগুলো সাইনবোর্ডই চীনাভাষায় লেখা। সামনে ছোট একটা বাংলো, তাতে একঘর মাদ্রাজী-পরিবারের বাস। অনতিদূরে পাহাড়ের উপর একটা সুন্দর বাংলো দৃষ্টিগোচর হলো। প্রণালীর কোল ঘেঁষেই পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ওপরকার বাংলোটি শুনলাম ইউরোপীয়ান রেস্টহাউস। কিন্তু ভারতীয় বিশ্রাম-ভবনের চিহ্ন কোথাও নেই। দোকানগুলোতে আনারস ও কলার কাঁদি সাজানো ছিল। পেটে খিদে, মুখে যে লাজ তাও নয়, কিন্তু কিনে যে খাব তার উপায় নেই—কেন না মার্চ করতে করতে চলেছি, কোথাও থামবার উপায় নেই এমনই কঠোর ডিসিপ্লিন। একটু এগিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে একটা ঘড়িঘর দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িটি অবশ্য অচল। নিকটেই একটি ছোট বাজার—বেচাকেনা বন্ধ রয়েছে দেখলাম। সামনে একটা বড় ফটক, পতাকা ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে বিজয়ী সেনাদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্যে। মালয়ী, ভারতীয় ও চীনাদের ছেলেছোকরারা কেউ অভিবাদন করছে কেউ বা আবার কলা দেখাচ্ছে। কলা দেখানোর মানে তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছিলাম। ইংরাজ ও অষ্ট্রেলিয়ান বন্দীদের দিয়ে জাপানীরা খুব কাজ করিয়ে নিত, যখন পরিশ্রমে কাতর হয়ে কাজ

করতে বাধ্য হতো তখন জোর করেই জাপানীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করতো। কিন্তু জাপানীরা এই 'কলা দেখানোতে খুব অপমানিত বোধ করে তাদের প্রহার করতো। দুঃখের বিষয় এখানে একটিও বাঙালীর মুখ দেখতে পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। চাটুজ্যেমশায় অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গীতে বললেন, "অত সহজে নিরাশ হবেন না। বাঙালী নেই এ-হেন ঠাঁই আবার দুনিয়ায় আছে নাকি? আমার ত বিশ্বাস দুর্গম উত্তর মেরুতেও বাঙালীর দেখা মিলবে। অতএব ধৈর্যং—আমার ধ্রুব বিশ্বাস এখানে কোন বাঙালীর বাড়িতে আশ্রয় জুটবে আর আমাদের নেশন্যাল ডায়েট শুক্ত আর মাছের ঝোলেরও সদ্‌ব্যবহার করা যাবে।"

অবশেষে আমরা রেস্ট হাউসে এসে পৌছলাম। চমৎকার জায়গাটি। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি। একটা বল খেলার মাঠ—এখানে মাথা গোঁজবার একটি কুটিরও দেখলাম না। মাঠে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাঠের পাশে রাস্তার ধারে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে জিরোতে লাগলাম। রাস্তাটি চওড়া ও পিচ ঢালা, দুপাশে ছবির মত সুন্দর কতকগুলো বাগানবাড়ি। আশেপাশে বন্যবৃক্ষের জঙ্গল। রাস্তার ধারে বসেই আছি। মিলিটারী ট্রাক চলে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে। রাশি রাশি ধুলো আমাদের গায়ে মুখে এসে পড়ছে। একটি একটি করে প্রায় সবগুলো গাড়ী এসে হাজির হলো, কিন্তু আমাদের গাড়ীর পাত্তাই নেই। গাড়ীসহ ড্রাইভার-প্রভুদের কখন যে শুভাগমন হবে মনে মনে তাই ভাবতে লাগলাম। এদিকে ক্লান্তিতে দেহমন অবসন্ন। গাছতলায় কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়! কাজেই শেষপর্যন্ত তুলোর বিছানার বদলে তরুতলে ধুলোর বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম। ধুলিশয্যায় শয়ন করে সেদিন যে আরাম পেয়েছিলাম, রাজশয্যাতেও

বোধকরি তা মেলে না। জাহাজে সেই যে সাতসকালে প্রাতরাশ সমাধা করা গিয়েছিল, তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। সঙ্গে ছিল আমেরিকান 'মিড-ডে' খাবারের টিন। তাই কেটে ভেতরকার খাদ্যদ্রব্যগুলোর সদ্ব্যবহার শুরু করা গেল। খিদেও পেয়েছিল বিষম। এতে থাকে বিস্কুট, কমপ্রেসড ফ্রুট, চকোলেট, গোমাংস। শেষেরটি অবশ্য বাদ দিতে হলো। জাহাজ থেকে প্রত্যেককে একটি করে ফিল্ডষ্টোভ কর্তারা দিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে চা তৈরী হলো। চা খেয়েই দেহমন চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

দুএকজন পাঞ্জাবী, সিংহলী ও তামিল পথচারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো। একজন পাঞ্জাবীর নিকট জাপানীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সে বললে যে, জাপানীরা চীনাদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছে। ভারতীয়দের ওপর তারা বড় একটা অত্যাচার উৎপীড়ন করেনি। জাপ অধিকারকালে লোকদের খাওয়া-দাওয়ার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিলো। অবশ্য এরা রেশনের দোকান অনেকগুলো খুলেছিল। লোকটিকে নাকি অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো ট্যাপিয়োকা (আলুর মত একরকম গাছের শিকড়) খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল—ভাত আর চাপাটির আস্বাদ লাভ করার সুযোগ অনেকদিন পর্যন্ত তাদের হয়নি। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের দৌলতে শেষে তারা দুবেলা পেটভরে ভাত খেতে পেতো।

ট্রাকের পর ট্রাক আসছে যাচ্ছে। রাস্তার ধুলো প্রচুর, চারিদিক ধূলিতে ধূলিময়, যেন ধুলোর ঝড় বইছে। ধুলো মেখে একেবারে ভূতনাথ সেজে বসে আছি। এ প্রসঙ্গে জাহাজের ভূতনাথটির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সিভিলে ছিলেন উকিল—বয়স বেশি হয়েছে। তাঁর নাম ছিলো কাপ্টেন ভোলানাথ, বাড়ী তাঁর যুক্তপ্রদেশে।

তিনি স্টাফ ক্যাপ্টেন লিগ্যাল হয়ে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের এক বাতিক ছিল, সব সময় পাউডার মাখা। এত বেশি পাউডার তিনি ঘষতেন, মনে হতো যেন তিনি সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেছেন। তাই তাঁকে ঠাট্টা করে ডাকতাম 'ক্যাপ্টেন ভূতনাথ'। ভদ্রলোক এতে রাগ করতেন না।

এবার ধূলিশয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। ঘুম কিন্তু কিছুতেই এলো না। চোখ চেয়ে দেখি একটা ছেলে, সম্ভবত ওড্রদেশীয়—আমাদের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে। তাকে আমাদের নিকটে আসতে ইসারা করলাম। কাছে এলে বাংলা ভাষা জানে কিনা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মালয়ী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লে, 'সিকি, সিকি' (মালয়ী ভাষার শব্দ, মানে অল্প অল্প) জানে। সে মালাবারের লোক—সেনগুপ্ত পদবীধারী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী পাচক। তার নামটা শুনে এবং সে ভৃত্য একথা জেনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন মনে পড়ে গেল—"কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।" শেষে ছোকরাটির সপ্রতিভ আর হাসিখুশি ভাব দেখে মনে বেশ আনন্দ হলো। বাঙালী পরিবার তাহলে এখানে একঘর আছে! কৃষ্ণকান্তের মুখে একথা শুনে আমরা উভয়েই খুশি হয়ে উঠলাম। উপযাচক হয়েই না হয় একদিন তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করা যাবে। প্রবাসে বাঙালী যে বাঙালীর কত প্রিয় সেকথা লোকমুখে অনেক শুনেছি এবং এসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিছু লাভ করেছি। ইম্ফলের প্রবাসী বাঙালী স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নিকট যে মধুর ব্যবহার পেয়েছি তা এ জীবনে ভোলবার নয়। এখনো মনে পড়ে সেই চাটুজ্যেমশায় মুখুজ্যেমশায় প্রভৃতির কথা। তাঁদের গৃহিণীরা পরমাত্মীয়ার মত কত যত্ন করেই না টাটকা মাছের ঝোল খাওয়াতেন।

তাঁদের রান্নার মধ্যে দরদী মাতৃহৃদয়ের স্বাদ যেন মিশে থাকতো।

দুজনে শুয়ে নানা রকমের জল্পনা কল্পনা করছি, এমন সময় 'কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক্ সাজিয়া আনে' একটি দশবারো বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। ছেলেটির চেহারা দেখলেই মনে হয় বেশ বুদ্ধিমান। এর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম। প্রশ্ন করে জান্‌তে পারলাম সে গুপ্তমশায়ের ছোট ছেলে, নাম শিবপ্রকাশ। সে ইংরেজী, মালয়ী, তামিল, জাপানী, সর্বভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। পেনাঙে বালকসেনার দলে ছয়মাসের জন্যে ট্রেনিং-এ গিয়েছিলো। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার অন্ত নেই। কয় মিনিটের আলাপেই বুঝতে পারলাম—নেতাজীর প্রসঙ্গই তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় প্রসঙ্গ। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা ভাবতে লাগলাম; নেতাজীর অতুলনীয় চরিত্র-মাহাত্ম্যের কথা। কোন গুণে তিনি এমনভাবে এমন করে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মন জিতে নিয়ে ছিলেন! চাটুজ্যেমশায় ওর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ফেললেন। চাটুজ্যেমশায়ের নাম শিবব্রত। শিবপ্রকাশ বয়সে অনেক ছোট হলেও তাকে তিনি মিতা বানিয়ে ফেললেন। আমাদের পেয়ে ছেলেটির ভারি আনন্দ। তখনই আমাদের তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলো। আমরা তখনই তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলুম না। কারণ আমাদের সঙ্গে প্রায় ৭০ জন লোক রয়েছে। আর কখন স্থানান্তর-গমনের আদেশ আসবে তাও ত জানি না। সবই ত টপ সিক্রেটের ব্যাপার কি না!

রাস্তায় মিলিটারী গাড়ী আটকে তাতে চেপে বেলা চারটার সময় আমি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম। আমাদের মেডিক্যাল বিভাগের কর্নেলকে গিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি তাঁর মেজরকে এ বিষয়ে

বললেন। মেজরটি আবার আর এক মেজরের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আমাদের অবস্থানের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করলেন। মিলিটারী ব্যাপারে সবসময় এই রকম হাতফের হয়। দ্বিতীয় মেজরটি আমাকে জানিয়ে দিলেন, তাঁদের হুকুম ছাড়া আমরা যেন ওখান থেকে এক পাও না নড়ি। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে 'ক্যাস্যাবিয়াঙ্কার' মত আমরা সেই রেস্ট হাউস-রূপ বল-খেলার ময়দানের পথপ্রান্তে পড়ে রইলাম!

ক্রমে ক্রমে দিন অবসান হয়ে এল। রাতে চাঁদের আলোয় পথ-ঘাট মাঠ বন আলোকিত হয়ে উঠলো। পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠেছে—আকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্মেঘ—মালয়ের মাটির বুকে শুয়ে নিচে মায়া-ছড়ানো জ্যোৎস্নারাত্রির অপরূপ সৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করতে লাগলাম। মাথার উপর আমাদের জ্যোৎস্না-প্লাবিত পূর্ণচন্দ্রশোভিত স্বচ্ছ সুনীল আকাশ—পদতলে সাগরের নীলাম্বুরাশির অশ্রান্ত গর্জন, শিয়রের দিকে ধুলিময় পথ—জ্যোৎস্নালোকে বালুকণা যেন স্বর্ণকণার মত জ্বলছে। জ্যোৎস্নাধারা যেন অমৃতপ্রবাহের মত আমাদের সর্বাঙ্গ অভিসিঞ্চিত করে দিয়ে আমাদের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হতে লাগলো। রাত্রির সৌন্দর্য মনে কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিলে। বহুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম—চোখদুটি ঘুমে জড়িয়ে এল। সঙ্গের লোকদের মাঠের মধ্যেই শোবার আদেশ দিয়ে আমরা সেই সুদূর প্রবাসে ভূমিশয্যায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

হঠাৎ রাত একটায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি টিপ টিপ করে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে। মেঘের কৃষ্ণাঞ্চলতলে পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশ আর পৃথিবী থেকে সবটুকু আলোক যেন মুছে ফেলে দিয়েছে। বুঝলাম অবস্থা সুবিধে নয়, কিন্তু এত কুঁড়েমিতে পেয়েছিল যে, কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ

ফিরে শুলাম। চাটুজ্যেমশাই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। প্রায় আধঘণ্টা পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। লটবহর ফেলে যে যেদিকে পারলে ছুট দিলে। পাশেই এ. আর. পি-র ট্রেঞ্চ—অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে দু'একজন তার মধ্যে পা পিছলে পড়ে বেশ চোট পেলে। রাস্তার পাশের জলভর্তি একটা নালায় পড়ে গিয়ে আমি একচোট নাকানি চোবানি খেয়ে উঠলাম। ঘুমের ঘোরে ছুটতে গিয়ে চাটুজ্যেমশায় একটা ছোট্ট গর্তে পড়ে গেলেন। জুতো মোজা সব ভিজে গেল। পথিপার্শ্বস্থ বড় বড় গাছের তলায় গিয়ে সবাইকে আশ্রয় নিতে হলো। রাত তখন তিনটা। সেখানে বসে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত জলধারার শব্দ শুনতে লাগলাম।

ভোর সাড়ে তিনটায় বৃষ্টি একটু থামলো—আমরা তখন আশ্রয় খুঁজতে বেরুলাম। আশ্রয় পেলাম একটা চীনা বাড়ির বারান্দায়, এখানটাও জলে ভিজে গেছে। জামাকাপড় কারও নেই, সকলের অবস্থা সমান। আমার স্যুটকেশটি খুঁজে খুঁজে দুটো গেঞ্জী ও দুটো অন্তর্বাস জোগাড় হলো। চাটুজ্যেমশায় ও আমাতে ভাগাভাগি করে নিলাম। সঙ্গের লোকদের কাছে দুটো শুকনো কম্বল জোগাড় হলো। একটা পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। জাহাজে প্রদত্ত লাইফ বেল্টটি ফুলিয়ে বালিশ তৈরী করলাম।

ভোর সাড়ে চারটায় আমরা উঠে পড়লাম। ভিজে কাপড়চোপড় পরেই বন্দরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম, আমাদের বিছানাপত্র এসেছে কি না খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি কোন জিনিসই আসেনি। ফেরবার পথে গুপ্তমশায়ের ছেলে শিবুর সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেল। আমাকে তাদের বাড়ির দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পথে গুপ্তমশায়ের সঙ্গে মোলাকাৎ হলো। ভদ্রলোক তাঁর ওখানে দুপুরেই

আমাদের খাবার নেমন্তন্ন করে ফেললেন। আমরা যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি চলে গেলেন।

যথাসময়ে নেমন্তন্ন রক্ষার জন্যে গুপ্ত-ভবনে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন কতরকমের তরকারী দিয়ে যে পাকস্থলী বোঝাই করতে হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া কঠিন। খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এসে শুনলাম এখান থেকে মাইল-পাঁচেক দূরে একটা দোতলা বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে। আমরা লোকজন নিয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাড়িটি বেশ নূতন ও দোতলা। জাপানীরা এখানে তাদের মিলিটারী স্কুল খুলেছিলো—এখনও তার কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

নূতন বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে গুপ্তমশায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখি চাটুজ্যেমশাই তাঁদের সঙ্গে গল্পে একেবারে মশগুল। আমিও তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলাম। গুপ্তমশায়ের কাছে শুনলাম সারা মালয়ের মধ্যে পোর্ট ডিকসনে নাকি "কালীপূজা" হতো এবং সমগ্র মালয় থেকে বাঙালী পরিবারের লোকেরা এসে আনন্দোৎসবে যোগ দিতেন। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দৌড়, সাঁতরকাটা ও গানের প্রতিযোগিতা হতো। সারা বছরের মধ্যে ঐ একটি দিনই প্রবাসী বাঙালীরা একত্রে মিলিত হতে পারত। এ সব শুনে মনে সত্যই আনন্দ পেলাম।

কথার শেষে গুপ্তমশায় আমরা কোথায় উঠেছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু চাটুজ্যেমশায় বাধা দিয়ে বিনীতভাবে বললেন যে, এ কথা বলা বারণ—কারণ এটা টপ সিক্রেট।

মালাক্কার পথে একদিন

দু-চারদিন আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম যে, আশেপাশের প্রায় সব জায়গাতেই ঘোরা গেল, মালাক্কায়ও একবার ঘুরে আসা যাক। অনেকের কাছে শুনতে পাই যে এই শহরটি মালায় দেশের সবচেয়ে পুরনো শহর। পোর্ট ডিকসন থেকে বেশি দূরও নয়। মোটের ওপর সাতান্ন মাইল হবে—যদি আমরা মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়া যাই। অনেকে বললেন, এ রাস্তাটা মোটে ভাল নয়—কোন রকমে যাওয়া যেতে পারে, তবে যদি সেরানবানের রাস্তা দিয়ে যেতে পারি তা হলে ভাল ও বেশ চওড়া পিচ্ঢালা রাস্তা পাব। এই পথ দিয়ে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। এই পথে কেনডং কাম্পঙের (গ্রাম) মাইল তিন-চার ছাড়িয়ে দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে—একটা বাঁয়ে ও একটা ডাইনে। বাঁয়ের রাস্তা সিঙ্গাপুরের দিকে গেছে, আর ডাইনের রাস্তা 'আলোর গাজা' শহরের ভেতর দিয়ে মালাক্কার পথে মিশেছে। এখান থেকে মালাক্কার দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল হবে। সেরানবান হতে পোর্ট ডিকসনের দূরত্ব আন্দাজ কুড়ি মাইল। আমাদের কিন্তু অত ঘুরপথে যেতে মন চাইল না—আমরা মালাক্কা প্রণালীর পাশ দিয়ে যাব স্থির করলাম। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেজন্য রবিবার দিন ইউনিটের লোকদের ছুটি দেওয়া হয়। সেদিন তারা একটু আমোদপ্রমোদ করে, আমাদের আপিসের কাজ আর লেবরেটরীর কাজ ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

আমরা সাতুই অক্টোবর রবিবার যাত্রার দিন স্থির করলাম। আগের দিন রাত্রে বেঙ্গল এস্টেটের ম্যানেজার গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, পরদিন সকাল আটটায় তাঁকে নিয়ে আমরা মালাক্কার পথে পাড়ি দেব। একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল যে, অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে এখানে বর্ষাঋতুর প্রাবল্য—তবে কোন কোন সময় জানুয়ারী মসের শেষ পর্যন্তও বেশ বৃষ্টি হয়, অবশ্য সারা বছর অল্পবিস্তর বৃষ্টি লেগেই আছে। শীতের প্রকোশ এখানে নেই বললেই চলে। সেদিন ভোরের দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো যাওয়া হবে না। তাই বিছানায় পড়ে রইলাম সাতটা পর্যন্ত। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল—আকাশও বেশ মেঘলা। চাকর দুটো সকাল থেকেই ঘুর-ঘুর করছে। আগের দিন রাত্রে তাদের বলা হয়েছিল যে, সকাল সাতটার আগে যেন তারা আমাদের ডেকে দেয়।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমরা জলযোগ করলাম। চাটুজ্যেমশায় একটু আপিসের কাজ করতে গেলেন। তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে গুপ্তমশায়কে আনতে গেলাম। বেলা তখন ন'টা বেজে গেছে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমাদের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন, একটা টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েছেন। টিফিন-কেরিয়ারে কি আছে জিজ্ঞসা করে জানতে পারলাম যে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েদের দিয়ে কিছু খাবার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু ভোজনবিলাসী তাই এ আয়োজনে খুশি হয়ে উঠলাম। এতদিন এখানে এসে ক্যাম্পে থেকে ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের কৃপায় শুধু 'কম্পো' * খেয়ে

*কম্পো—প্যাসিফিক কম্পো।

আমরা এসেছিলাম এখানে আক্রমণকারী সৈনিকদের সঙ্গে—যুদ্ধ লাগলে

কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বাঙালী মা-বোনদের হাতের রান্না যদি এই বিদেশবিভুঁইয়ে এসে মেলে তবে সেটা ভাগ্যের কথা। বেলা প্রায় দশটায় আমাদের গন্তব্য পথে রওনা হলাম। আমরা থাকতাম পোর্ট ডিকসন হতে সাড়ে-চার মাইল দূরে মালাক্কা যাবার পথে আর গুপ্তমশাই থাকতেন পোর্ট ডিকসন শহরের মধ্যে।

মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে আমাদের জীপ গাড়ী ছুটল। জীপ-চালক স্বয়ং চাটুজ্যে মশাই—চালান ভালই, কিন্তু তিনি গাড়ীর গতি কখনও মন্থর হতে দেন না যদি না পথের মধ্যে বাঁক থাকে। ডান দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করছে।

দূরে মালাক্কা প্রণালী—অগণিত জাহাজ ভাসছে। বালুময় তীরের ওপর প্রণালীর ঢেউয়ের বিফল আঘাতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ও তার সঙ্গে বাতাসের ফোঁসফোঁসানি আমাদের বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঢেউয়ের জল উঠে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে গেল। প্রাণালীর ধারে ধারে খোলা জায়গায় কোথাও সাপ্লাই আপিস, কোথাও কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে বেশ ছোট ছোট কয়েকটি সুন্দর বাংলো দেখলাম, সবই ইট-কাঠের তৈরি। বাঁ-দিকে সারি সারি রবার গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। এখানে কতকগুলো সুড়ঙ্গ দেখলাম। এগুলো জাপানীরা তৈরি করে গেছে—সৈন্যেরা এখানে লুকিয়ে যুদ্ধ চালাবে বলে। এই সুড়ঙ্গগুলোর মধ্যে ঢুকতেই ভয় করে, পাহাড়ের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। এই পাহাড়ের

আমাদের আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। সেজন্য আমাদের বরাদ্দ ছিল 'কম্পো'র মধ্যে টিনের ভিতর হরেক রকম খাবার। প্রথম কিছুদিন আমরা এই খেয়েই ছিলাম। এ সমস্তই আমেরিকার জিনিস। লবণ থেকে সিগারেট পর্যন্ত এর মধ্যে থাকে।

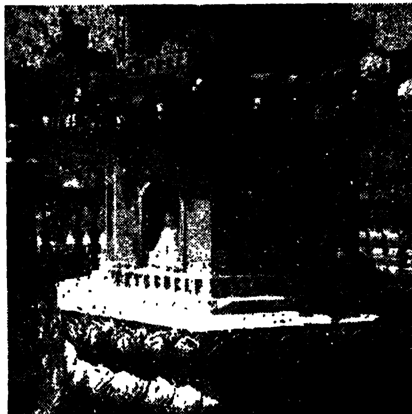
ওপর আগে মালয়ী সৈন্যদের 'হেড কোয়ার্টা'র ছিল। বেশ সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাংলো রয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ব্রিটিশ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হচ্ছে। আমরা এসব ছেড়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটি মন্দ নয়, বেশ চওড়া ও পিচঢালা; তবে মাঝে মাঝে পিচের সঙ্গে পাথর উঠে গর্ত হয়েছে দেখতে পেলাম। শুনলাম কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাস্তাটি খুব ভাল ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুদের চলমান বড় বড় ট্যাঙ্ক আর বুলডোজার* এর দফা একেবারে সেরে ফেলেছে। কিছু দূরে ডানদিকে একটা খোলা মাঠ রয়েছে, সেখানে আগে নারিকেল গাছ জন্মানো হত। কোন কারণে সেগুলোকে কেটে ফেলেছে—গুঁড়িগুলো এখনও রয়েছে দেখলাম। খানিকটা এগিয়ে দেখি প্রণালীর ধারে বড় বড় জাহাজ থেকে ট্যাঙ্ক, জীপ, বুলডোজার, ট্রাক ইত্যাদি একে একে বেরিয়ে আসছে। বেশ মজা লাগল দেখতে। মালয় অধিকারের জন্য এত সৈন্যসামন্ত ও এত যুদ্ধের সরঞ্জাম এরা এখানে আনবে, এদের মধ্যে থেকেও আমরা তা বুঝতে পারিনি। বাঁ-দিকে পাহাড় ও রবারের বন চলেছে একটানা—মাঝে মাঝে আতপ পাতা দিয়ে ছাওয়া মালয়ীদের ছোট ছোট বাড়ি। প্রণালীর ধারে বড় বড় বাংলো রয়েছে। এগুলো সবই ছিল ব্রিটিশদের অবস্থানের জন্য।

যুদ্ধের আগে ভারতীয় কিংবা মালয়ীদের এখানে আসবার অধিকার ছিল না। এখন সেখানে সবাই বাস করছে—ভারতীয় অফিসার থেকে সিপাহী পর্যন্ত।

মাইলদশেক আসবার পর দুধারে বেশ ঘন ও বড় রবার গাছের বন দেখা গেল। গাছগুলোর মধ্যে বেশ ফাঁক রয়েছে, আমাদের

*** বুলডোজার—পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করবার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, দেখতে অনেকটা ট্যাঙ্কের মত।**

জীপ অনায়াসে ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। গাছগুলো সরু হয়ে উঠে গেছে কতকটা নারকেলগাছের মত। ডানদিকে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে "Rifle Range"। এদিকে জাপানী সৈন্যদের রাইফেল-চালানো শিক্ষা দেওয়া হত। এদিকে বেশ ঘন রবার-বন রয়েছে। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে সোজা রাইফেল রেঞ্জের দিকে, আর একটা পথ বাঁদিকে গেছে রবার-বনের মধ্যে।



বৌদ্ধমন্দির, আনসান রোড

এই নূতন রাস্তাটা জাপানীরা তৈরি করেছে Cape Rachad-তে যাবার জন্যে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ, জীপের মত ছোট্ট গাড়ী অনায়াসে যেতে পারে। একটা পাহাড় পার হয়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হয়। এখানকার রাস্তা ভয়ানক খারাপ, পাহাড়ের জল এসে রাস্তার মধ্যে নালা করে দিয়েছে। এই পাহাড়ের মাথার ওপর একটা বাতিঘর রয়েছে। এর প্রায় সবটাই ভেঙেচুরে

গেছে। এখানে একটা দূরবীন্‌ও ছিল—সেই দূরবীন্‌ দিয়ে সুমাত্রার সমুদ্রতট দেখতে পাওয়া যেত। কিছু নিচে একটা মন্দির আছে—সকল দেশের মানুষ সেখানে গিয়ে পূজো দেয়। বড় পাহাড়ের মাথায় যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল, না হলে বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি অতিকষ্টে এই পথ দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম।

মালাক্কার পথে আরও দুই মাইল এগিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে কতকগুলো রবার-বন সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে দেখা গেল। এই সব জায়গায় মালয়ীরা কিছু কিছু শস্যের আবাদ করেছে দেখতে পেলাম! এখানে জাপানীরা খুব চেষ্টা করেছিল ফসল উৎপাদন করবার জন্যে, কিন্তু বিশেষ ফললাভ করতে পারেনি। ফসলের মধ্যে টেপিয়োকা-ই বেশি ফলত। গাছগুলো ঢেঁড়স গাছের মত দেখতে। পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ফুট উঁচু হয়। এগুলোর শেকড় থেকে গজায় মিষ্টি-আলুর মত। এগুলো খেলে শুধু পেটই ভরে—শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। জাপানী আমলে প্রথম দিকে এই এক কাঠির (আড়াই পোয়ার) দাম ছিল পাঁচ থেকে দশ ডলার; শেষের দিকে ১০০ থেকে ২০০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল।* তখন এখানকার লোকেরা—বলতে গেলে ভাত

* জাপানীদের আমলে একটা সিগারেটের দাম ১০০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। ৭০০১ ডলারের কম কেউ একটা ছোটখাটো সংসার প্রতিপালন করতে পারত না। চোরাবাজারের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হ'ত। চাকরীর ২০০।৩০০ ডলারে কুলোত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মাইনে ২০০০ ডলার ছিল। জাপানীরা তখন এ সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। এ সব ঘটেছিল তাদের আত্মসমর্পণের কিছু আগে। এখন প্রত্যেকের কাছে প্রায় ১০ হাজার থেকে ১০০ হাজার পর্যন্ত জাপানী ডলার আছে। এখন এর কোন মূল্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দিচ্ছে না।

তো চোখেই দেখতে পেত না। অবশ্য ধনীদের কিংবা যাঁরা ধান-চাল গুদামজাত করে রেখে দিতেন তাঁদের কথা আমি বলছি না। জাপানীরা সরকারী রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেটা মনে হয় লোক-দেখাবার জন্যে, তাতে লোকের একবেলাও পেট ভরত না। এই রকম করে এখানকার লোকের দিন চলত। এখানে চীনারা বেশি ধনী, তারাই সব ব্যবসা একচেটে করে রেখেছিল। তারা, জাপান-সরকারকে মোটা চাঁদা দিয়ে রেহাই পেত। ব্রিটিশদের আমলে এ ধরনের কষ্ট এদেশের লোকেরা পায়নি। ব্রিটিশরা এদেশে পা দিয়েই গ্রামে গ্রামে বিনি পয়সায় চাল বিলিয়েছে। আগেকার দিন ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা এরা করেছে। শুধু করেনি বাংলায় যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরল।

চাটুজ্যেমশায় গাড়ী চালিয়েই চলেছেন, থামবার নাম নেই। কিছুদূর গিয়ে গুপ্তমশায় একটা বাগানের কাছে গাড়ী থামাতে বললেন। বাগানটা এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের। এর মধ্যে ছোট একটা বাংলো আছে—আগে ইনি এখানে থাকতেন। এখন আর এদিকে থাকেন না। বাংলাদেশের আম, চালতা, শিউলিফুলের গাছ সবই আছে। ভদ্রলোক তামিল ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন। প্রায় তিন মাইল যাবার পর আমরা একটা গ্রামে এসে ঢুকলাম। এর নাম পাসার পাঞ্জাং, রাস্তার দুধারে দোকান-পাট রয়েছে। সব মালয়ী ও চীনা এখানকার অধিবাসী। তবে এখানকার চীনারা সকলেই প্রায় ধনী। এখানে চীনারাই দোকান করে বসে আছে—মালয়ীরা বাজারে মাছ ও তরকারী বিক্রী করছে দেখা গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা প্রকাণ্ড বিজয়-তোরণ রয়েছে। সব জাতের পতাকা দিয়ে

এটাকে সাজিয়েছে—কিন্তু পরাধীন ভারতের পতাকা উড়তে দেখলাম না। এদেশের চীনারা প্রায় সকলেই সাম্যবাদী; তাদের কি ঘরে, কি বাইরে, কি মোটরে—সব জায়গায়ই একটা করে সাম্যবাদী পতাকা উড়ছে। ছোট ছোট চীনা ও মালয়ী ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। আমরাও তাদের প্রত্যভিবাদন করলাম। এদিকে মিলিটারী গাড়ী মোটেই দেখতে পাওয়া গেল না। এক বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন একটু দূরে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমরা এগিয়ে চললাম।

দুপাশে সারি সারি রবারের বন চলেছে। মাঝে মাঝে মাঠ, জলা জায়গা, রবারের কাটা গাছ তাতে ভাসছে। মালয়ী ছেলেরা ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরছে। তার মধ্যে জাপানী কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্মিত আতপ-গাছের পাতায় ছাওয়া কতকগুলো ভেঙে-পড়া কাঠের বাড়ি জলে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখলাম। আমরা কিছুদূর যাবার পর পেঙ্গাল কেমাপাস নামক গ্রামে ঢুকলাম। পোর্ট ডিক্সন থেকে পেঙ্গাল কেমাপাসের দূরত্ব ২১ মাইল, এখানেও চীনা ও মালয়ী বস্তি, ভারতীয় এখানে খুব কম। চীনা মেয়েরা খুব প্রগতিশীলা। প্রত্যেকেরই প্রায় একটা করে সাইকেল আছে। সকলেই রাস্তায় সেজেগুজে বেড়াতে চলেছে। মালয়ী মেয়েরা, কি গরীব কি ধনী সকলেই একটা করে লুঙ্গির মতন বাহারে ছাপ-দেওয়া কাপড় পরে। সেই রকমই ছাপ-দেওয়া একটা করে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত বড় কোট গায়ে দেয়। বেশির ভাগ মালয়ী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় না। খোঁপার বাহার দেখবার জিনিস। কেউ তাতে ফুল গুঁজে, কেউ বিলিতি রঙ-বেরঙের ফিতা দিয়ে খোঁপাটিকে মনের মত করে সাজায়। এরা সকলেই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, দেখতে অনেকটা বাঙালী মেয়েদেরই মত—কিন্তু নাক

চেপ্‌টা। শরীর এ:দের খুব মজবুত।.এখানকার বাজারের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে—রাস্তার দু'ধারে মালয়ী ও চীনাদের বাড়ি। গ্রামে নারকেলগাছ, কলাগাছ, পেঁপেগাছ ও কাঁটালগাছ প্রচুর দেখলাম—অনেকটা লিচুর মত দেখতে এক রকম ফল আছে যার নাম 'রম্বুতান', এখানে খুব ফলে। 'ডোরিয়ান' ফল কাঁটালের মত দেখতে ; বিশ্রী গন্ধ, কাছে যেতে পারা যায় না। ফল পাকলে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে, কিন্তু মুখে গন্ধ লেগে থাকে—ধুলেও যায় না। আনারস প্রচুর হয়।



আক্কের হিতুম, পেনাঙ

মাইল-ছয়েক গিয়ে আমরা একটা মোড়ের মাথায় এলাম। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে সেরানবানের দিকে, আর ডানদিকের রাস্তাটা গেছে মালাক্কার দিকে। এখানে একটা ছোট গ্রাম দেখলাম। এখানকার বাসিন্দা সবাই মালয়ী। একটা পচা খাল পাশ দিয়ে চলেছে। এটা পার হয়ে আমরা ডানদিকে চললাম। একটু এগিয়ে দুদিকে বেশ ধানের

ক্ষেত রয়েছে দেখলাম, এর মাঝে মাঝে আতপগাছগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু-দশ ঘর মালয়ী ও চীনা এদিকেও রয়েছে—সবাই চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মাইলচারেক যাবার পর আমরা নেগ্রী সেম্বিলান ও মালাক্কার সীমান্তে এসে পৌছলাম। এখানে ফেডারেটেড মালয় স্টেটের একটা শুল্ক আদায়ের আপিস রয়েছে। কয়েকটি বাংলোও আছে, সব জলে ডোবা। এর পরেই একটা ছোট খাল—পোলের ওপর দিয়ে পার হতে হয়। বর্ষাকাল বলে বৃষ্টির জল মাঠ ছাপিয়ে রাস্তাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পার হয়ে আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। এর নাম লাবুচিনা পাসার,—পাসার মানে বাজার। বাজারটি ছোট, বড় নোংরা। শুটকী মাছের মধুর গন্ধে বাজারটি আমোদিত হয়ে রয়েছে!

একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম দুদিকে ধানের ক্ষেত সমানভাবে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এদিকটায় ধান মন্দ হয় না। ঠিক যেন বাংলাদেশেই আছি বলে ভ্রম হয়। রাস্তা সব জলে ডুবে গিয়ে মাঠের সঙ্গে মিশে গেছে। এদিকটায় খুব নিচু জমি। মাইলতিনেক অতিক্রম করে দেখি আবার সেই ঘন পাহাড়ী জঙ্গল ও রবারের ক্ষেত চলেছে সার দিয়ে। এদিকে আসতে লোকে এখনও ভয় পায়, কারণ চীনা ও জাপানী গরিলা সৈন্য পথে-ঘাটে লুকিয়ে আছে শুনতে পাওয়া যায়। বনের পাশে মালয়ীদের আতপ-ছাওয়া কুটীর মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। ধনীই হোক আর গরীবই হোক এরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করে। বাড়ির আশপাশ তকতকে ঝকঝকে, একটুও নোংরা দেখলাম না। বাড়ির সামনে এরা ছোট ছোট বাহারে ফুল গাছ পুতেছে। কারও কারও বাড়ির ভেতর ছোট-বড় ঢোলক ঝুলছে, এরা সংগীতপ্রিয়। কিছুদূর যাবার পর

আবার সেই শ্যামল ধানের ক্ষেত ও নারকেল-বাগান, আতপের সারি। এখানে পাহাড়ের ওপর ছবির মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ি রয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। আধমাইল এগিয়ে আমরা একটি ছোট শহরের মধ্যে এসে পড়লাম। এ শহরটির নাম মস্‌জিদ টানা। এখানে 'ইট-কাঠে' তৈরী বাড়ি চোখে পড়ল। এই শহরের দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে। বাঁদিকের রাস্তা ধরলে আমরা আলোর গোজা শহর দিয়ে মালাক্কায় পৌছাতে পারি। লোকের মুখে শোনা যায় যে আলোর গোজার পর থেকে রাস্তা খুব ভাল। আমরা সোজা রাস্তা ধরে চললাম। এদিকে গ্রাম ছাড়াবা-মাত্রই রাস্তার দুধারে শুরু হলো কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন, কোথাও বা রবারের ক্ষেত। প্রায় পাঁচমাইল যাবার পর আমরা সুঙ্গি উডাং গ্রামে এসে পড়লাম।* গ্রামে ঢুকতেই একটা থানা নজরে পড়ল, একটি মালয়ী বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে। এখানে পাকা বাড়ি দেখলাম না। একটু এগিয়ে একটা মালয়ী স্কুল দেখতে পেলাম। সবই পাতলা কাঠের বাড়ি, কিন্তু বেশ বড। এর পরেই বাজার,—বাজারটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কেউ কেউ দোকানে বসে গুড়গুড়ি টানছে। এখানে সবই মালয়ী তবে দু-একজন চীনাও দেখলাম। এখানকার ছোট বাচ্চারা আবার জাপানী-কায়দায় সেলাম করে। এদিককার গ্রামে বেশ লোকজন আছে। এখান থেকে মালাক্কা শহর প্রায় তের মাইল হবে।

তিন-চারমাইল এগিয়ে যাবার পর আর একটা গ্রামে এসে পড়লাম। এর নাম হচ্ছে টাঙ্গু বাটু, এখানে একটা বড় স্কুল দেখলাম।

---

* Udang—চিংড়ি মাছ, Sungi—নদী। বোধ হয় এখানকার নদীতে খুব চিংড়ীমাছ পাওয়া যায় তাই এই গ্রামের নাম Sungi Udang.

এদিকটা বেশ পরিষ্কার। মস্‌জিদ প্রায় সব গ্রামেই একটা করে আছে। এগুলো কোঠাবাড়ি তবে ছাদগুলো বড় টালি দিয়ে ছাওয়া। ভেতরে গিয়ে দেখলে বাংলার মস্‌জিদের মত মনে হয়। বড় বড় ঢোলক একটা করে সব মস্‌জিদেই আছে। এদিকটায় বেশ ধানক্ষেত দেখলাম। এখানকার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বেশ চালাক ও পরিশ্রমী। চীনারা বাংলাদেশের জমিদারদের মত এদেশীয়দের শোষণ করছে।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে পৌঁছলাম। মাঝে মাঝে পিচ উঠে গিয়ে পথের রাঙামাটি বেরিয়ে পড়েছে। তুধারেই লোকের বাড়িঘর। গ্রামটি ছাড়িয়ে সোজা চললাম। ক্রমে ক্রমে আমরা মালাক্কা প্রণালীর তীরে এসে পড়লাম। মালাক্কা শহর এখান থেকে সাড়ে-ছয়মাইল হবে। তীরভূমির ধার দিয়ে বিরাট অট্টালিকা উঠেছে, সবই পাশ্চাত্ত্যধরনের। সামনে এক-একটা করে ছোট-বড় বাগান রয়েছে। একটু আগে তু'ধার থেকে বড় বড় সুন্দর বাড়ি উঠেছে। এ বাড়িগুলো সবই চীনাদের। বাড়িগুলো দেখে বালিগঞ্জের কথা মনে পড়ে গেল। এইসময় এখানে বর্ষাকাল কিন্তু রাস্তাঘাট যেন ঝক্ ঝক্ করছে। এদিককার রাস্তা সুন্দর, চওড়া ও পিচঢালা।

এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগল। এখান থেকে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গলভরা দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়—জেলেরা মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে। জোয়ার চলে গেলে শুক্‌নো বালুময় তীরে এরা 'পাগার' তৈরি করে। কতকগুলো বাঁশের বেড়া তৈরি করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেয়। জলের দিকে একটু ফাঁক রাখে মাছ ঢোকবার জন্যে। যখন জোয়ার আসে ছোট-বড় মাছ সব ভেতরে ঢোকে, কিন্তু জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে না। ভাটার সময় জেলেরা মাছগুলো ধরতে পারে। এইরকম বহু 'পাগার' এখানে

দেখলাম। দূরে জেলেডিঙ্গি দিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। একটু আগে বাঁদিকে মালয়ীদের গোরস্থান। এখানকার রাস্তা মাঝে মাঝে একেবারে প্রণালীর ধার দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে, জল মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ছে। মালাক্কায় ঢোকবার মুখে বড় বড় অট্টালিকাগুলো দেখে মনে হয়েছিল শহরের ভিতরেও এই রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পাব। কিন্তু ঢুকেই চোখে পড়ল অত্যন্ত অপরিষ্কার ছোট-বড় বাড়িগুলো মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে উঠেছে। এই বাড়িগুলো সবই চীনাদের। বাইরের দরজাগুলোতে সোনালীরঙের প্রলেপ। মালয়ী এখানে খুব কম, বেশির ভাগ অধিবাসীই চীনা। ভারতবাসী এবং সিংহলীও এখানে খুব কম। এখানকার চীনারা খুব ধনী ও ব্যবসায়ী। মনে হয় দেশটা যেন চীনাদেরই।

চীনাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা করে দোকান আছে—স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই বেচাকেনা করছে। এরা এখন মাতৃভাষা একরকম বর্জন করেছে। প্রায় সবাই মালয়ীভাষায় কথা বলে। সাড়ে বারোটায় আমরা মালাক্কায় পৌঁছি, সেখানে নানা জিনিসপত্র সওদা করতে করতে একটা বেজে গেল। তারপর জীপ চালিয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরতে হলো, সামনেই একটা বড় পোল। এটা মালাক্কা নদীর উপর। পোলটা পার হয়ে সামনেই টাওয়ার ক্লক—তবে এখন ঘড়িটা অচল হয়ে রয়েছে। এর সামনেই লালরঙের অনেকগুলো পুরানো বাড়ি। পেছনে পাহাড়ের ওপর পুরাতন পর্তুগীজ কেল্লা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

১৫০৯ খৃঃ ১লা আগষ্ট। ভোরবেলা সূর্যের আলো সমুদ্রজলে প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ নৌসৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল ডি

সিকুইর সদলবলে পালতোলা পাঁচটি সওদাগরী জাহাজ নিয়ে মালাক্কার বন্দরে এসে অবতরণ করলেন। এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয় এখানে আসেনি তাই তাদের দেখবার জন্যে রাস্তায় ভীড় জমে গেল। জনতা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলো, এই নূতন মানুষদের দেখে তারা বেশ কৌতুক বোধ করতে লাগল। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন সুলতান মামুদ। এডমিরাল সাহেব



মালাক্কার প্রাচীন দুর্গ তোরণ

সঙ্গে করে নিজের দেশের কতকগুলো দামী দামী জিনিস ভেট-স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুলতানকে সেলাম করে সেগুলো উপহার দিয়ে মালয়ে ব্যবসা করবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন একজন তামিল, তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে বাহ্যত ভাল ব্যবহারই করলেন বটে, কিন্তু তাদের মালাক্কায় আগমনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। এরা ভারতে ব্যবসা করতে গিয়ে কালিকট দখল করেছে সে-কথা তাঁর অজানা ছিল না। নিজের

মনোভাব তাদের কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে তিনি যথোচিতভাবে অতিথিসংকারের আয়োজন করলেন। কিন্তু তাঁর আসল মতলব কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গোসহ ডি সিকুইর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া। কিন্তু যবদ্বীপের একদল গুপ্তচর পর্তুগীজদের নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিলে।

একথা জানতে পেরে এডমিরাল ডি সিকুইর মাত্র বিশজন পর্তুগীজকে সেখানে রেখে আত্মরক্ষার্থ সমস্ত জাহাজ নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে গেলেন। ডি সিকুইর যাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন তারা মালাক্কার কারাগারে পচতে লাগলো।

এডমিরাল কালিকটে এসে তার মনিব আল-বুকার্ককে সব কথা খুলে বললেন। কিন্তু তখন এশিয়াখণ্ডে পর্তুগীজদের যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা খুব কম, লোকবলও নিতান্ত নগণ্য। তখনকার মত প্রতিশোধ কামনা চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হলো। কিন্তু বছর-দুই পরে ১৫১১ খৃঃ তিনি ১৯টি জাহাজ, ৮০০ পর্তুগীজসৈন্য ও ছয়শত ভারতীয় সৈন্যসহ মালাক্কার পথে পাড়ি দিলেন। যথাসময়ে তারা সমুদ্রতীরে এসে অবতরণ করলেন। হঠাৎ পর্তুগীজদের কামানের শব্দে মালাক্কাবাসীদের চমক ভাঙল। মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড গর্জনে সমুদ্রতীর মুখরিত হয়ে উঠলো। আল-বুকার্ক খোলাখুলিভাবে সুলতান মামুদকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মিত্রভাবে এখানে আসেননি তিনি এসেছেন প্রতিশোধ নিতে। তাঁর দাবী হচ্ছে ডি সিকুইর বিশজন সঙ্গীকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর যদি না তারা জীবিত থাকে তো তাদের প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এখানে তাঁর দুইটি শত্রুপক্ষ ছিল। একটি হচ্ছে সুলতান মামুদের দল—আর অপরটি মূর সওদাগরের দল। বন্দরে মূরদের যে-কয়টি জাহাজ নোঙ্গর করে

অবস্থান করছিলো পর্তুগীজদের কামানের মুখে প্রথমে সেগুলোই বিধ্বস্ত হলো।

এদিকে একটি সেতুমুখ রক্ষা করবার জন্যে মালয়ীরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে একত্র এসে সমবেত হলো। সেইটিকে ধ্বংস করবার জন্যে পর্তুগীজরা প্রচণ্ড বিক্রমে দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলো। কারণ তারা জানতো যে এই সেতুটিকে বিধ্বস্ত করতে পারলে মালাক্কার পতন সুনিশ্চিত। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার মালয়ী বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। হাতে তাদের বিষাক্ত তীরধনু ও বল্লম, সর্বাঙ্গ বর্মে আচ্ছাদিত। পর্তুগীজদেরও কামান গর্জে উঠলো। মালাক্কার সমুদ্রতীরে শুরু হলো উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু তীরধনু নিয়ে কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে কতক্ষণ লড়াই করা চলে, সেদিন দেশরক্ষা করতে গিয়ে কামানের মুখে কতশত মালয়ী যে আত্মাহুতি দিলে তার ইয়ত্তা নেই। এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু হায়, সুলতানের সাহায্যার্থে সেদিন কেউই এগিয়ে এল না—অনেকে বরং মাতৃভূমিকে বিদেশীদের হাতে সঁপে দেবার জন্যে সুলতানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। অবিশ্রান্ত গোলাগুলিবর্ষণের মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মালয়ীদের পক্ষে সম্ভবপর হলো না। তারা গিয়ে পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলো।

পর্তুগীজরা ধীরে ধীরে পাহাড়টিকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু অকস্মাৎ যবদ্বীপের একদল যোদ্ধা এসে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করলো। পর্তুগীজরা সেই মুষ্টিমেয় আততায়ীর আক্রমণ প্রতিহত করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড সূর্যের তাপে অস্থির ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তারা জাহাজে

ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এই সময় সুযোগ বুঝে মালয়ীরা আবার প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করে শহর অধিকার করলো। নয়দিন পর্যন্ত তারা ভয়ে-ভয়েই মাঝ দরিয়ায় অবস্থান করতে বাধ্য হলো। আল-বুকার্ক ইতি-কর্তব্য কিছু স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি কতকগুলি চীনা গোয়েন্দার পরামর্শে একদিন গভীর রাত্রে চুপিচুপি দুইটি চীনা জঙ্কে (বড় নৌকা) করে কামান বন্দুক আর লোকজনসহ সেই বিখ্যাত সেতুটির ওপর চড়াও হলেন।

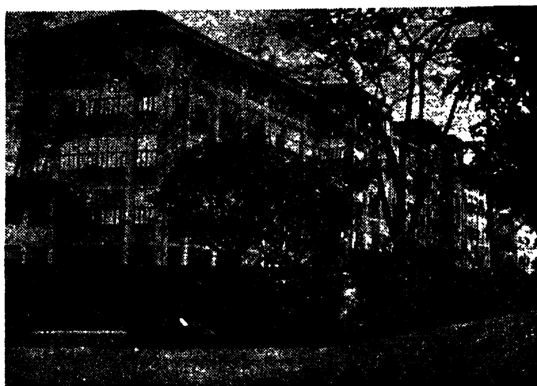
অকস্মাৎ সেই গভীর নিশীথে কামানের গর্জনে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, নিমেষমধ্যে বোমাবর্ষণে সেতুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নদীর গর্ভে আশ্রয় নিলো। সেতুটি বিধ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ ও ভারতীয় সৈন্যেরা দলে দলে মালাক্কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুইদিন ভীষণ যুদ্ধ হলো। মালয়ীরা শেষপর্যন্ত পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। সুলতান প্রাণরক্ষার জন্যে এক অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তিনি মনে করেছিলেন পর্তুগীজরা লুটপাট করেই মালাক্কা ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তাদের মালাক্কা পরিত্যাগ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আল-বুকার্ক বরং সুলতানকে পাহাংএর গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে একটি মজবুত কেল্লা নির্মাণান্তে মালাক্কায় বাস করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত পর্তুগীজরাও আবার ওলন্দাজদের নিকট পরাজিত হয়ে মালাক্কা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো।

এখানে কিছু দেখবার নেই। শুধু কতকগুলো অস্থিকঙ্কালসার দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এটি বোধ হয় তৈরি হয় খ্রীঃ পূঃ ১৫১১-১৬০৫ অব্দের মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীর মোড় ফেরানো হলো

একেবারে সিঙ্গাপুরের পথে। এখানে বাঁদিকে মেয়েদের কন্‌ভেন্ট, ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, রেষ্ট হাউস, খেলার মাঠ রয়েছে। ডানদিকে মালাক্কা প্রণালীর ধারে কতকগুলো জাপানী বন্দীকে প্যারেড করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তাদের বেশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ। কিছুদুর যাবার পর ডানদিকে উঁচু প্রাচীরঘেরা জেলখানা নজরে পড়ল। একটা দোতালা কাঠের বাড়ি মাঝখানে রয়েছে, তাতে কয়েদীরা থাকে। ডানদিকে ছোট একটা রাস্তা জেলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। আমরা ভিন্ন একটা বড় রাস্তা ধরে সোজা বাঁদিকে চললাম। ডানদিকে একটু দূরে একটা পাহাড়ের ওপর পর্তুগীজদের আর একটা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দেখলাম। আন্দাজ আধমাইল এগিয়ে আমরা একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে গেলে সিঙ্গাপুরের দিকে যাওয়া যায়—বাঁদিকে এগোলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মালাক্কা শহরে পৌঁছানো যায়। আমরা সোজা চলে গেলাম একটা ছোট গ্রামের ভেতরে সেন-মশায়ের বাড়ির খোঁজ করবার জন্যে। সামনে একটা উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। পাহাড়টি বেশ বড়—ইটের গাঁথুনির দরুন। এটির দৃশ্য বেশ বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। এই পাহাড়টির নাম 'বুকিত চিনা', আর ঐ ইটের গাঁথুনিগুলো চীনাদের কবর। এই রকম দুটো পাহাড় এখানে কবরে কবরে ভরতি হয়ে গেছে, কোথায় একটুও ফাঁক নেই। তাই চীনা-সম্প্রদায় ঠিক করেছে যে সমাহিত করার চেয়ে পোড়ানোই ভাল। খানিকক্ষণ পরে পাহাড়ের ওধারে গার্ডেন সিটিতে গিয়ে সেনমশায়ের বাড়ি খুঁজে বের করলাম! সেখানে আর একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হলো। মালাক্কায় বাঙালী-পরিবার খুব কম। ইতিমধ্যে সেনমশায়ের স্ত্রী আমাদের খাবারের জোগাড় করতে চাইলেন। দুপুরে রোদ খাঁ খাঁ করছে, এমন সময় বাইরে যেতে

কারও ইচ্ছে হয় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেনমশায়কে নিয়ে জীপে করে বেরিয়ে পড়লাম—মালাক্কা শহর দেখবার জন্যে। জেলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। এবার আমরা মালাক্কা শহর ও মালাক্কা হাসপাতাল দেখবার জন্যে যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরলাম। খোলামাঠে রোদের মধ্যে জাপানীদের সেই অবিরাম প্যারেড চলেছে। শহর পার হয়ে আমরা গ্রামের ভেতরে ঢুকলাম, ধানের ক্ষেত এখানেও রয়েছে। একটি ঘেরা চত্বরের মধ্যে বড় বড় পাঁচতলা বেশ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখলাম। সামনে ডানদিকে বড় একটা গেট—লাল মাটির পথ চলে গেছে ভেতরের দিকে। আমাদের জীপ আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল। খানিক ঘুরে আমরা মিত্র-মশায়ের বাড়ি এসে উঠলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন, আমাদের পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আমরা তাঁর সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে চললাম। খানিকটা যাবার পর দেখি সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। মিত্রমশায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ওটা খালিই পড়ে ছিল অনেকদিন থেকে। জাপানীরা যখন এদেশ দখল করে আধিপত্য বিস্তার করে তখন ছাত্রদের সুবিধার জন্যে সিঙ্গাপুর মেডিকেল স্কুল উঠিয়ে দিয়ে মালাক্কায় স্থানান্তরিত করেছিল। সিঙ্গাপুরে তখন তারা মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল। এক অংশে দেখলাম ছেলেদের হোস্টেল, আর একটি অংশে ক্লাস। নিচে ছেলেদের মেস রয়েছে। প্রত্যেক খাবার টেবিলে নাম লেখা রয়েছে—এখনও কেউ পরিষ্কার করেনি। চীনা, সিংহলী, মালয়ী ও ভারতবর্ষীয় সব জাতির ছেলেরা এখানে পড়তে এসেছিল এই নামাবলী দেখেই বুঝতে পারলাম। এদের পড়াবার জন্যে ভাল ভাল অধ্যাপক

জাপান থেকে এসেছিলেন। নূতন দু-একটি ঔষধও যুদ্ধের সময় এরা তৈরি করেছিল। এর পরে আমরা গেলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। মেঝে ও পাশের দেয়াল (সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত) রবার দিয়ে মোড়া। কেউ জোরে চললে যেন পদশব্দে রোগীদের বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাঘাত না হয়। নার্সদের অনুমতি নিয়ে আমরা ওয়ার্ডে গেলাম। এখানে রোগীর সংখ্যা খুব কম—প্রায় সবাই গরীব মালয়ী। জাপানী আমলে



হাসপাতালের একাংশ

এরা এখানে আসতে ভয় পেত—এখন জাপানীরা চলে যাওয়াতে একে একে এসে জুটছে। তিন শ্রেণীর কেবিন দেখলাম। নার্সগুলি সব চীনা—মালয়দেশে এদের জন্ম; স্বাস্থ্যবতী ও বেশ কর্মঠ। জাপানী আমলেও এরাই ছিল এখানকার নার্স। এদের উপর জাপানীরা কোন অত্যাচার করেনি। এখানে অনেক অস্ট্রেলিয়ান নার্স ছিল যুদ্ধবন্দী হয়ে—তাদের প্রতি নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে আমরা পাঁচতলার ছাদে উঠলাম। সেখান থেকে মিত্রমশায়

পুরনো হাসপাতাল দেখালেন, একটা বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলো অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এখান থেকে 'জোহর বারু'র পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়, দূরে কালো পাহাড় মেঘে ঢাকা। হাসপাতালের নির্মাণ আরম্ভ হয় ইং ১৯২৮ সালে এবং শেষ হয় ইং ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ওখান থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড এবং প্যাথোলোজি রুম দেখতে গেলাম। পাশেই মর্গ (পোস্টমর্টেম রুম) রয়েছে। এই সব দেখবার পর মিত্রমশায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন।

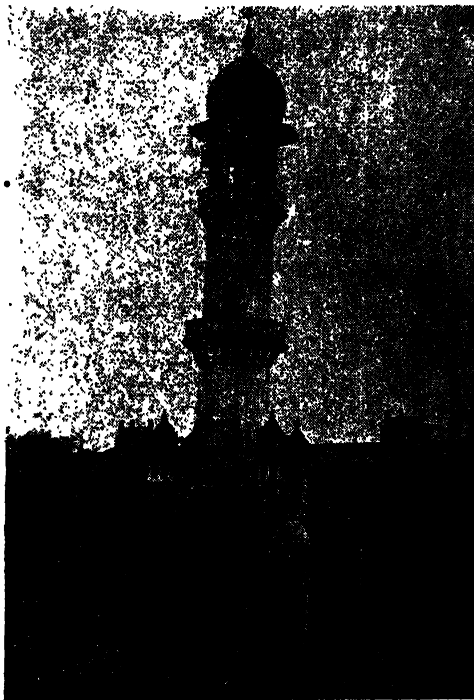
চা-পান সেরে ফিরলাম বাজারের দিকে, বাজারটি শহরের এক পাশে—শাকসব্জী অনেকরকম নজরে পড়ল। সেখান থেকে একটু দূরে মালাক্কা রেলওয়ে স্টেশন। গিয়ে দেখি স্টেশনটি ঠিকই আছে—কিন্তু রেললাইন নেই। জাপানীরা শ্যামের কাছে রেললাইন পাতবার জন্যে এগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। আমি শ্যামের ওদিকে গিয়েছিলাম, কিছু কিছু নূতন রেললাইন পাতা হয়েছে দেখেছি। শহরের মধ্যে অনেক দোকানপাট রয়েছে—ছোট ছোট রাস্তা আর সব চীনাদের দোকান। এখানে সব জিনিস সস্তা।

আর দেরি করা যায় না—ক্যাম্পে আজই ফিরতে হবে, তাই সেন-মশায়ের ওখানে খাবার জন্যে গাড়ীর মোড় ফেরান হলো। সেন-গৃহিণী চমৎকার হালুয়া আর কফি তৈরি করে রেখেছিলেন। খেতে বেশ লাগল। নমস্কার জানিয়ে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম।

কোয়ালা-লামপুরের অভিজ্ঞতা

পোর্ট ডিকসনে কিছুকাল থাকার পর আমি বদলি হয়ে ক্লাংএ চলে এলাম। এদিকে আসবার দুটো পথ আছে—একটা হচ্ছে সেরানবনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কোয়ালা-লামপুর হয়ে, আর একটা আছে 'মরিব বিচ' দিয়ে। মরিব বিচের পথে দূরত্ব কমে কিন্তু রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এপথে অন্য রাস্তার দ্বিগুণ সময় লাগে। তবু আমি কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখবার জন্যে এ-রাস্তাটাই ধরলাম। এদিক দিয়ে গেলে মালয়ীদের ছোট ছোট অনেক গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় আর নজরে পড়ে 'মরিব বিচ' মাইলের পর মাইল-ব্যাপী নারিকেলবৃক্ষের শ্রেণী। সমস্ত মালয়ের মধ্যে এখানেই নারিকেলগাছ জন্মে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু নারিকেল-তৈলের কোনো কারখানা আজ পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি। বৃটিশদের নির্মিত একটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। কারণ মালয় আক্রমণ করবার জন্যে এখানেই প্রথমে তারা অবতরণ করে। মাইলকয়েক যাবার পর ক্লাংএ পৌঁছলাম। এখানে পাহাড়ের ওপর সুলতানের প্রাসাদ ও নিচে একটি মনোরম মস্‌জিদ দেখলাম। এখানে ছোট একটি হাসপাতাল, স্কুল, বাজার, সিনেমা প্রভৃতি সবই আছে। খানকয়েক বড় বড় বাড়ি আছে, প্রায় সবগুলিই চীনা ও চেট্টিয়ারদের সম্পত্তি। এখান থেকে পোর্ট সোয়েটেনহ্যাম চার মাইল। ভারতে আসতে হলে হয় পেনাং কিংবা সিঙ্গাপুর থেকে, না হয় এখান থেকে জাহাজে করে আসতে হয়। এখানকার সোয়েটেনহ্যাম নদী এত বিরাট যে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে এখানে যাতায়াত করতে পারে। এখান থেকে কয়েক মাইল গেলে

তবে মালাক্কা প্রণালী পাওয়া যায়। মালয়ের বহু জায়গাই দেখলাম কিন্তু এত অস্বাস্থ্যকর জায়গা আমার চোখে পড়েনি। ভারতবর্ষ থেকে আগত যাত্রীদের নামবার সময় কোন ছোঁয়াচে রোগ দেখা দিলে এখানে



আরব মসজিদ

তাকে আটক রেখে দেওয়া হয়। কিছুদিন এদিকে থাকবার পর আমি কোয়ালা-লামপুরে বদলি হয়ে চলে এলাম। এখান থেকে কোয়ালা-লামপুর আটাশ মাইল। আমাকে ক্লাং নদীর নতুন সেতু পার হয়ে

আসতে হলো। পুরানো সেতুটি বৃটিশরা চলে যাবার সময় ভেঙ্গে দিয়ে যায় কিন্তু মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট এই নতুন পুলটি তৈরী করে দিয়েছে ; এটি একটি ঝোলানো সেতু।

কোয়ালা-লামপুরের দিকে আসবার সময় রবার বৃক্ষের সারি খুব বেশি করে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে টিনের খনি আর মালয়ী ও ভারতীয় কুলীদের ছোটছোট ব্যারাকও দেখতে পাওয়া যায়। গোটাকয়েক ছোটছোট শহর পার হয়ে আমরা কোয়ালা-লামপুরে এসে পৌঁছলাম। শহরে ঢোকবার মুখেই পড়ে রেল ষ্টেশন। এখানে কতকগুলি ভগ্ন রেলগাড়ী পড়ে আছে। জাপানী আমলে আমেরিকানরা এসে বোমা-বর্ষণ করে এগুলো ভেঙ্গেচুরে তছনচ করে দেয়। এখানে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ নিয়ে বোমা ফেলতে আসতো, জাপানীদের উড়ো-জাহাজ-মারা কামান ছিল না বলে তারা এদের কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। ভগ্ন গাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকেই রয়েছে বিখ্যাত কোয়ালা-লামপুর মিউজিয়াম। এটি বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একটু এগিয়ে গেলে পাহাড় দিয়ে ঘেরা কয়েকমাইল-ব্যাপী একটি লেক গার্ডেন দেখতে পাওয়া যায়। লেকের উভয়তীরস্থ পুষ্পোদ্যানে অসংখ্য বিলাতী ও দেশী ফুলের গাছ, অজস্র ফুল ফুটে অপূর্ব শোভা বিস্তার করছে। পাহাড়ের মাথায় রেসিডেন্টের প্রকাণ্ড বাসভবনটি দেখতে চমৎকার। বাগানের মধ্যে গোটাকয়েক বাড়ি ও একটি কৃষিবিভাগ রয়েছে। এখানে একটি কৃষিগবেষণাগারও আছে।

সমগ্র মালয়ে সিঙ্গাপুর ও কোয়ালা-লামপুরের মত বিরাট স্টেশন আর নেই। স্টেশনের নিকটবর্তী রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড ম্যাজেষ্টিক হোটেল। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় মৃত বৃটিশ সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। মালয় অধিকারকালে যে-সকল সৈনিক যুদ্ধে

জীবন উৎসর্গ করেছিলো—এটা তাদেরই স্মৃতিস্তম্ভ। এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে ডাইনে পড়ে গভর্নমেণ্ট অফিস আর বাঁদিকে খেলবার মাঠ। এই মাঠের সঙ্গে নেতাজীর স্মৃতি বিজড়িত.। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি ১৯৪৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বলেছিলেন: "বন্ধুগণ, বৃটেনকে পরাজিত করতে আমাদের বাইরের সাহায্যের আবশ্যক হবে। আমাদের শত্রু পৃথিবীর সর্বত্র সাহায্য প্রার্থনা করছে। যেখানে সূর্য কখনো অস্ত যায় না বলে কথিত হয়, সেই সর্বশক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আপনাদের সমগ্র ভারতীয়দিগকে স্বদেশের সেবা করবার এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবার এক অভিনব সুযোগ দিয়েছেন।"

মাঠ পেরিয়ে টাউন হল, সুপ্রিম কোর্ট, মালয়ীদের বড় একটি মসজিদ, টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যাদি। রাস্তার দুদিক দিয়ে বড় বড় অট্টালিকাসমূহ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্যাভিলিয়ন, ওডিয়ন প্রভৃতি বড় বড় সিনেমাহাউসগুলোও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীনা ও ভারতীদের বড় বড় দোকানগুলোতে কেনা-বেচা বেশ চলছে। এসব দেখে বাজারে এসে হাজির হলাম। বাজারটি খুব বড়। কতকগুলো স্বর্ণকারের দোকান দেখলাম; তবে বেশির ভাগ গহনাই ক্যারেট্‌গোল্ডের। চীনারা ঠেলাগাড়ী করে খাবার নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, কেউ কেউ রাস্তার পাশেই বসে মাংস ও নানাপ্রকার খাবার বিক্রি করছে। আর তাদের ঘিরে বসে ছেলেবুড়ো সবাই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা শুরু করে দিয়েছে।

এখানকার 'পুডু' জেলটি খুব বড়। এখানে লঘুদণ্ড থেকে আরম্ভ করে ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়। সেদিন কতগুলো জাপানী বন্দীকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল!

আমরা জাভা স্ট্রীট পার হয়ে বি. বি. পার্কের পাশ দিয়ে চলে এলাম। রাত্রে এই পার্ক খোলে, দিনের বেলা বন্ধ থাকে। একটু এগিয়ে গেলেই ইংরাজদের সুইমিং ক্লাব দেখতে পাওয়া যায়! ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে একটি বড় গবেষণাগার আছে। বিভিন্ন দেশের লোকেরা গবেষণা করেন—একজন ইংরাজ এখানকার গবেষণাগারের পরিচালক। পাশেই আমাদের মিলিটারী হাসপাতাল। এখানে আমার বন্ধু লেঃ বণিক ও মেজর গোপেন মুখার্জী আছেন শুনলাম। এখানে যেতেই এঁরা খুব মধুর অভ্যর্থনা জানালেন। এদের কাছে শুনতে পেলাম এখান থেকে অর্ধমাইল দূরবর্তী সেণ্টুল নামক শহরে রবি রায় নামক একজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী আমাদের যে রকম আদর-আপ্যায়ন করলেন তা জীবনে ভোলবার নয়। এখান থেকে আমরা বিখ্যাত বাতুকেভ দেখবার জন্যে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের সেই আদি ও অকৃত্রিম চাটুজ্যেমশায়, মিঃ চৌধুরী ও রবিবাবু। বাতুকেভে যেতে হলে পেনাং রোড দিয়ে যেতে হয়। রাস্তাটির বাঁদিকে নজরে পড়ল আই. এন. এ. ক্যাম্প। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আতপপাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কাঠের ঘরগুলোতে অনেক বন্দীকে দেখলাম। ভারতের প্রায় সকল জাতির লোকই এদের মধ্যে আছে। সকলের মুখেই লেগে আছে হাসির রেখা—বন্দীজীবনের কঠোরতায় ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। আমরা মিত্র পক্ষীয় লোক, আমাদের পানে ওরা বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—এরা হয় তো আমাদের কৃপার পাত্র বলে মনে করে। ওদের চোখে চোখে তাকাতে আমাদেরও লজ্জা হয়। গেটের ধারে দণ্ডায়মান বৃটিশ প্রহরীরা আমাদের অভিবাদন করলে আমরাও তাদের

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে এগুতে লাগলাম। পেনাং রোডে পাঁচ মাইল গিয়ে আরও মাইলখানেক ভেতরে গেলে তবে কেভে যাওয়া যায়। প্রকাণ্ড একটা বিলের ধারে একটি চুনাপাথরের পাহাড়ে গুহাটি অবস্থিত। প্রায় ২৫০টি বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলে তবে গুহামধ্যে ঢুকতে পারা যায়। ভেতরে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানেও দেখি দেশের তীর্থস্থানের মত পাণ্ডার উৎপাত। ঠাকুর-দর্শন করাবার জন্যে তারা এসে ছেঁকে ধরলে। কিছু কিছু প্রণামী দিয়ে তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলাম। পাণ্ডারা সকলেই তামিল ব্রাহ্মণ। এর ভেতরে পর্যন্ত জাপানীরা লাইন পেতে অস্ত্রশস্ত্র টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছিল। এখনও রেললাইন পাতা রয়েছে দেখলাম। বৃটিশরা এখানে এসেই এ-গুহা থেকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও সোনা-রূপা উদ্ধার করেছিলো। এখানে এত জাপানী নোট ছিল যে সেগুলোকে স্থানান্তরিত করতে তিন টনের দশটি লরী লেগেছিল। ছোট ছোট আরও অনেক গুহা দেখতে পেলাম। গুহার ভেতর থেকে সুমুখের পানে তাকালে একফালি আকাশ নজরে পড়ে। সেই অন্ধকার পুরী থেকে একটু করে নীল আকাশ দেখতে যে কি চমৎকার লাগে তা বলে শেষ করা যায় না। গিরিগাত্র বিরাটাকার বনস্পতি সমূহে সমাচ্ছন্ন।

এ শহরের প্রান্তভাগে একটি বিমানঘাঁটি আছে। তার পাশে পাশে চীনাদের বিচিত্রিত কতকগুলি কবর। এই গোরস্থানের নিকটেই আতপপাতায় ছাওয়া কতকগুলো ভাঙ্গা মাটির ঘর দেখে বিশেষ বিবরণ জানবার জন্যে কুতূহলী হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সেগুলো জাপানী হাসপাতাল আর এদের বাসস্থান। পরে আমায় প্রতি সপ্তাহে একবার করে এদের এই হাসপাতালটি পরিদর্শন করতে যেতে

হতো, আমায় দেখে এরা মাথা নিচু করে কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করতে করতে নিয়ে যেত ওদের হাসপাতালে। এদের জেনারেল থেকে সিপাহী পর্যন্ত সবাই মিত্রপক্ষের অফিসারদের সেলাম করতে আইনত বাধ্য ছিল। হাসপাতালে আমাকে একটি চলনসই ভাঙ্গা চেয়ারে বসতে দিলে। ওদের ডাক্তার অফিসার ও কমাণ্ডিং অফিসার মেজর এসে আমায় স্যালুট করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বসতে বললাম। এরা বসতে চাইলেন না, কারণ আমাদের সঙ্গে চেয়ারে বসা এদের পক্ষে আইনবিরুদ্ধ। অনেকেরই লজ্জানিবারণের ল্যাঙট্ ব্যবস্থাটা ঠিক ভদ্রোচিত নয়। ডাক্তারটি আমার চেয়ে বয়সে বড়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে অনেক কথা আমায় তিনি বললেন। তাঁর সব কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হাসপাতালে রোগী দেখলাম। রোগের মধ্যে আমাশায় ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদির রোগই বেশি। ঔষধপত্রের ও পথ্যাদির ব্যবস্থা এখানে আশানুরূপ নয়।

সেখানে কিছুক্ষণ বসবার পর এঁরা আমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করে নিয়ে এলেন। ডাক্তারটি দুঃখের সঙ্গে জানালেন: "নো মিল্ক, নো সুগার,, বাট্ ভেরী, গুড।" মনে মনে ভাবলাম 'নো টি' হলে আরও ভালো হতো, এ অভিনব চা-পর্বটা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হতো। কিন্তু কি করি এযে ফেলাও যায় না, আবার গেলাও যায় না। ফেলতে গেলে চক্ষুলজ্জায় বাধে, গিলতে গেলে বাধে গলায়। শেষপর্যন্ত চুমুক দিতে হয়। দিয়ে বলি ইনডিড ভেরী গুড ক্যাপ্টেন। আমার কথায় তিনি খুব খুশি হয়ে এই 'র'-টির প্রশংশায় শতমুখ হয়ে উঠলেন। এখন এই অপূর্ব চায়ের অপচয় করা যায় কি করে, অগত্যা সবটাই গিলতে হলো। পঞ্চতিক্ত কষায়ের মত এ বিস্বাদ চা-রস কি গলা দিয়ে নামতে চায়! চা যাই হোক, এঁদের আদর-আপ্যায়নে খুব আনন্দিত

হলাম। এঁদের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ গল্প হলো। নিজেদের বাড়িঘরের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, ইত্যাদি। ক্রমে বেশ আলাপ জুড়ে দিলেন, তাদের দেখবার জন্যে তাঁরা কি যে উদগ্রীব আবেগের সঙ্গে তাই বলতে লাগলেন। এঁদের কথায় বেজে উঠল বেদনার সুর। একজন বললেন যে, তাঁর দুমাসের কোলের ছেলে দেখে এসেছেন, এখন নিশ্চয়ই সে হাঁটতে শিখেছে। কেউ ম্লানমুখে বললেন যে, হিরোশিমা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব আশা ফুরিয়ে গেছে। বলতে বলতে তাঁর গলা কেঁপে গেল, অনেক চেষ্টা করেও উদ্গত অশ্রুকে রোধ করতে পারলেন না। শেষে অপরিচিতের সামনে চোখের জল ফেলা লজ্জাজনক বলে ঝটিতি স্থান ত্যাগ করলেন। এঁদের এইসমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনে আমার কেবলি মনে পড়তে লাগল—"What war has made of man." কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে চলে এলাম কিন্তু সেদিন হৃদয়ে যে-বেদনার স্মৃতি বহন করে এনেছিলাম তা আমার মানসপট থেকে কখনও মুছে যাবে না।

সেদিন রাত্রে আমরা বি. বি. পার্কে গেলাম। এটি একটি আমোদ প্রমোদের জায়গা, এখানে ঢুকতে গেলে স্থানীয় লোকেদের ১০ সেণ্ট বা দশ পয়সা দিতে হয় কিন্তু মিলিটারীদের ওসব খরচের বালাই নেই। ভেতরে হরেকরকম জিনিসের দোকান আছে—জুতা থেকে কাপড় জামা পর্যন্ত সবকিছু সেখানে বিক্রয় হয়। বেশির ভাগই জুয়াখেলার আড্ডা, তবে এখানে টাকা-পয়সার লেনদেন নেই। বিলিতি ও জাপানী জিনিসপত্রের আদান প্রদান চলছে। এখানে দুটো চীনা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলছে। নানারকম সাজপোশাক ও বড় বড় পালকের মুকুট পরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চিৎকারের আর বিরাম নেই, একঘেয়ে ক্রন্দনটুকু বড় বিরক্তিকর ঠেকছে। শুনলাম ওটা কান্না নয়, গান।

আমি ওদের সাধারণ ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারি বটে কিন্তু ওদের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মধ্যে এত পার্থক্য যে, সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেইজন্যেই নাটকের প্রাদেশিকতা-পূর্ণ সংলাপ বুঝতে আমার খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। অভিনয়কালে এরা আমাদের রঙ্গালয়ের মতন প্রেক্ষাগৃহের দরজা জানলা ইত্যাদি বন্ধ করে দেয় না। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের জায়গাটুকু এরা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে। কাজেই বাইরে থেকেও লোক ভাল করেই অভিনয় দেখতে পারে। বেশির ভাগ মালয়ীরা ও ভারতীয়েরা বাইরে থেকেই অভিনয় দেখে, বাইরের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে চীনাকেও দেখতে পাওয়া যায় তবে তারা সংখ্যায় খুব কম। আর একটি ফাঁকা জায়গায় দেখলাম বড় বড় দুটি তক্তাপোশের উপর দুটি মালয়ী পুরুষ ঢোলক ও অন্য একটি বাজনা নিয়ে বসে আছে আর তাদের পাশে দুটি মেয়ে সেজেগুজে চেয়ারে উপবিষ্ট। শুনলাম ওরা নাচওয়ালী। আনাপাঁচেকের মত দিলেই নাকি ওদের সঙ্গে এক চক্কর নৃত্য করা যায়। ওরা মালয়ীভাষায় গান করতে করতে নৃত্যের তালে তালে একবার সামনে এগিয়ে আসে পরক্ষণেই পিছিয়ে যায়। এদের নৃত্য দেখে দর্শকদের মধ্যে কারো কারো চিত্ত নৃত্যরসে উতলা হয়ে ওঠলো। তারা আসন ছেড়ে আসরে গিয়ে তাদের অনুকরণে এমন বেতালে পা ফেলতে লাগল যে, এটা যে নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। আমাদের দুজন ভারতীয় সেপাইও দেখলাম নৃত্যে একেবারে মশ্‌গুল। তাদের নাচটা অনেকটা ডাঙ্গায় তোলা কইমাছের মত। এই নৃত্যের নাম রঙ্গিলা নাচ। খানিকক্ষণ এই অভিনব নৃত্যরস উপভোগ করে আমরা স্থানত্যাগ করলাম। রাস্তার ধারেই চীনা খাদ্য-বিক্রেতারা উনান ধরিয়ে খাবার তৈরী করেছে। তাদের চারপাশে ভোজনেচ্ছু

বালিকা যুবতী ও বৃদ্ধাদের ভিড় জমে গেছে। ভোজনপর্বটা এরা রাস্তায়ই সেরে নিচ্ছে। সব দোকানে শূকরের মাংস আছে—এটা চীনাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আমাকে একদিন আমার এক চীনা বন্ধু খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমাদের যে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অনেক বাছবিচার জানতেন, সেজন্য আগে থেকে আমায় জিজ্ঞাসা করে নিয়ে খাদ্যতালিকা থেকে আমাদের নিষিদ্ধ খাদ্যগুলো বাদ দিয়েছিলেন। আমি শূকর ও গোমাংস খাই না জেনে তাঁর আপশোষের আর অন্ত ছিল না। সেদিন তিনি আমার জন্য ভাত ও নানারকমের মাছের তরকারির ব্যবস্থাই করেছিলেন। ওদের ফ্রায়েড রাইস (ভাজা ভাত) স্টিম্‌ড্‌ ফিস (সিদ্ধ মাছ) আর নানারকম ফল ও ডিমের স্যালাড খেতে খুব ভাল লাগলো। শুটকিমাছ দিয়ে মাচাং বলে একরকম খাবার তৈরী করা হয়েছিল। চীনা বন্ধু মাচাংএর খুব তারিফ করতে লাগলেন, এই বহুপ্রশংসিত মাচাং কিন্তু আমার রুচলো না।

এখানকার বিলাতী নাচঘরে গেলাম। তখন রাত্রি ১০টা, পুরোদমে নাচ চলেছে। নৃত্যের আসরটি বেশ তকতকে ঝকঝকে —নৃত্যকারিণীদের লীলায়িত দেহভঙ্গী—মাঝে মাঝে তাদের চাপা-হাসির শব্দ, মঞ্চ থেকে ভেসে আসা অবিরাম বাদ্যধ্বনি—সবকিছুতে মিলে বেশ একটি মোহময় আবেষ্টনের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক নাচ চলে মাত্র আড়াইমিনিট ধরে। আমাদের যাবার কিছুক্ষণ পরেই নাচের আসর ভেঙ্গে গেল। পরমুহূর্তেই বসতে না বসতেই উজ্জ্বল আলো নিভে গেল, নাচ আবার আরম্ভ হলো। এ-নাচ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ দেখি চৌধুরী পাশে নেই, চুপিসাড়ে কখন উঠে গেছে। বুঝলাম তাকে নাচে পেয়েছে। হঠাৎ নাচের আসরে তার নৃত্যপর মূর্তিখানা নজরে পড়লো। নাচের কায়দাগুলো চৌধুরী বেশ

আয়ত্ত করেছে দেখলাম। পাশে ফিরে দেখি চাটুজ্যেমশায় মাটিতে পা দিয়ে তাল দিচ্ছেন। নাচটা শেষপর্যন্ত সংক্রামক হয়েই উঠলো দেখছি। চৌধুরীর নাচ শেষ হবার পরেই রুম্বা নাচের বাজনা শুরু হলো। অনেক পরিচিত ভারতীয় বন্ধুদের 'রুম্বা' নাচ নাচতে দেখলাম। এতো নাচ নয়, রীতিমত কসরৎ। অনেকক্ষণ পরে নাচের আসর ভাঙ্গলো—আমরাও যে-যার ঘরে ফিরে গেলাম।

এখানে এসে কতকগুলো জিনিস বেশ চোখে লাগলো—তাতে আমি প্রথম প্রথম বেশ আশ্চর্য বোধ করতাম কিন্তু পরে আমার এসব গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। নাচটা যে একটা সংক্রামক রোগ হয়ে উঠেছিল তা নয়, বাঙালী ছেলেদের মধ্যে সোমরস পান করে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্যে তাদের মাঝে মাঝে বেশ মত্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত। আর তারও সঙ্গে ছিল এখানে অবাধ নারীপ্রীতি। কি ঘরে কি বাইরে সর্বদা এইগুলো আমার চোখে এসে বেশ কষ্ট দিত। আমি ও-সমাজে মিশতাম না বলে তাদের কাছে আমি নির্বোধ হয়েই ছিলাম। এসব কুৎসিত ব্যবহারগুলো আমাকে বলে তারা বেশ গর্ব বোধ করতো। এখনও মাঝে মাঝে বাঙলা মায়ের কোলে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু এখনও তাদের স্বভাব তারা বদলাতে পারেনি। এই মদ্যপানের মত্ততার জন্যে কখনও কখনও তাদের বিদেশে প্রাণহানির উপক্রম পর্যন্ত হয়েছিল।

সেদিন তুসনটুয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কোয়ালা-লামপুর থেকে এর দূরত্ব প্রায় পনেরোমাইল হবে। সেরানবান শহরের অভিমুখে যে প্রশস্ত পথটা চলে গেছে সেই পথে মাইলসাতেক গিয়ে আমাদের বাঁদিকের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে প্রায় মাইলআষ্টেক যেতে হলো। এদিকের গ্রামগুলিতে বেশির ভাগ গরীব মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়েরা

রয়েছে দেখলাম। মাঝে মাঝে দু-একটা পাসার বা বাজার চোখে পড়লো। 'বাঙলার পাড়াগাঁয়ের হাটের মতনই।' সেই মাঠের একপাশে চালাবাঁধা আটচালা; আশেপাশে দু-চারখানা ভগ্ন কুটির। সেখানে প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যায় দেখলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে আমরা দুসনটুয়ায় এসে পৌছলাম। দুসনটুয়ার মধ্যে দিয়ে দুসনটুয়া নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যেখানে এসে পৌছলাম সেখানে একটি পুল রয়েছে—এটি পার হয়ে আমরা নদীর ওপারে গেলাম। সেখানে দ্রষ্টব্য ছিল একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণটি ইট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। সেখান থেকে একটি নল দিয়ে গরম জল অনতিদূরে একটি বাংলোর চৌবাচ্ছায় আনা হচ্ছে। আর বেশির ভাগ উষ্ণ জল নদীর গর্ভে স্থান পাচ্ছে। এখানে অনেকগুলি বাংলো রয়েছে। শুনলাম পূর্বে এখানে ধনী-সম্প্রদায়ের লোকেরা আমোদ-প্রমোদ করতে আসতেন। প্রত্যেক ঘরের জন্যে প্রত্যহ আড়াই থেকে তিনটাকা তাদের দিতে হতো। এখানে জাপানীদের কতগুলি কবর ও তাদের থাকবার অনেক চিহ্ন দেখতে পেলাম। শুনলাম জাপানীদের এখানে একটি হাসপাতাল ছিল। এখানে আমাদের সৈন্যেরা বেশ আনন্দে আছে দেখলাম।

উষ্ণ প্রস্রবণের জল খুব স্বাস্থ্যকর, সেজন্যে অনেকে এখানে বাস করতে আসতেন, এখানকার লোকের মুখে শুনতে পেলাম। সেদিন এখানকার দু-একজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আমরা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে দুসনটুয়া ত্যাগ করলাম।

টাইপিংএ ক'দিন

টাইপিংএ আমার বেশ কিছুদিন কেটে গেল—চৈনিক বন্ধু এং. হং. লিম আর পার্শী বন্ধু জিমি মানেকসর সঙ্গে। লিম ছিলেন একটি ছোট্ট বেঁটে দোহারা লোক। তিনি ছিলেন সদ্ভাষী, হাস্যরসিক আর স্পষ্টবক্তা স্কুল-মাষ্টার, আর জিমি ছিলেন তাঁর চেয়েও ছোট একটি সদাহাস্যময়, সরলপ্রাণ ব্যবসায়ী। এঁরা দু-জনই বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। লিম ছিলেন সংসারী আর জিমি ছিলেন অবিবাহিত। স্কুলের ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ইউনিটে এসে হাজির হওয়া ছিল লিমের প্রাত্যহিক কাজ—সঙ্গে অবশ্য সবসময় থাকতেন আমাদের জিমি। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের বিদেশীর অনুকরণে রোজ একটু করে ড্রিঙ্ক্ করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এমন কি অনেক বাঙালী প্রবাসীদেরও এটা যে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তা এখানে দেখতে পেলাম। আর সব ভারতীয়ের কথা আমি ছেড়েই দিলাম। যুদ্ধের মধ্যে বিলাতী মদ খুব দুষ্প্রাপ্য ছিল। জাপানী আমলে দেশের চীনা অধিবাসীরা আনারস ও নারকেলগাছের রস থেকে একপ্রকার মদ তৈরী করতো—যা সকলে তখন পান করতো। শুনতে পেলাম যে এইসব মদে চীনারা নানা রকমের শিকড় চূর্ণ করে মেশাতো যাতে করে মদ পান করবার সঙ্গে সঙ্গে মত্ততা আসে। এই সব শিকড়-মিশ্রিত মদ পান করে অনেক লোক মারা যেত। জাপানীদের এসব পান করা আইনে নিষিদ্ধ ছিল।

আমরা মালয়ে আসবার কিছুদিন পরেই বিলাতী মদ আসা শুরু হলো—কেবল সৈন্যদের জন্য। সিভিলিয়ানদের জন্য তখনও পর্যন্ত আমদানী হয়নি। আমাদের 'রেশন' অনুযায়ী আমি প্রচুরই পেতাম। কিন্তু ও-সবের সুখ ছিল না বলে বন্ধুবর্গ আমার কোটার সুযোগ গ্রহণ করতেন। বাইরে কালোবাজারে মদ বেশ উচ্চমূল্যেই বিক্রয় হতো। এ-সব জিনিস, বাইরে থেকে কেউ কিনলে মিলিটারী পুলিসের হাতে হতো নির্যাতন; সেই ভয়ে অনেকে কিনতেও চাইতেন না।

কিছুদিন পরে একজন পাঞ্জাবী শিখ আমাদের দলে এসে জুটলেন। তিনি ছিলেন স্কুলমাষ্টার—বন্ধু লিমের সঙ্গেই এক স্কুলে পড়াতেন। তাঁকে ডাকা হতো 'মুণ্ডেয়া' বলে। কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিল সুজন সিং। ভদ্রলোকের লাহোরে বাড়ি, কিন্তু এখানে ছোটবেলা থেকেই বসবাস করে আসছেন, আর বাড়িঘরদোর এখানেই তৈরী করেছেন। তবে মাঝে মাঝে ভারতে তিনি আসা যাওয়া করেন। তিনি ছিলেন চমৎকার আমুদে লোক—গল্পগুজবে সময় কাটাতে বেশ গুণীলোক ছিলেন। বন্ধু লিমের ছিল অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, ছোটটিকে আমার বেশ ভাল লাগতো। সে ছিল আমার মেয়ে মিনার সমবয়সী। একে পেয়ে মিনিকে যেন ফিরে পেতাম। তার জন্যে অনেক কষ্ট করে একটু চীনাভাষা আয়ত্তে আনতে হয়েছিলো। প্রথম প্রথম আমার মিলিটারী বেশ দেখে সে বেশ ভয়ই পেতো, কিন্তু তার জন্যে চকোলেট আর লজেন্সের বরাদ্দ করে রোজই আনতে হতো, সে জন্য কিছুদিনের মধ্যেই আমি তার বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। ঘরে গেলে সে আমার কোলে কাঁধে চেপে চুমা খেতো। বড় মেয়েগুলোকে কোনোদিন সিনেমা দেখানো, কোনোদিন লেকের ধারে জীপে করে ঘুরিয়ে আনতে হতো। তারা আমার ঘরে গিয়েও বেশ উৎপাৎ আরম্ভ করে দিত।

এরা সব ভালভাবেই লেখাপড়া শিখেছে—ইংরাজী যেন এদের মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরাজীতে এরা অনর্গল কথা বলতে পারে। এদের মধ্যে বিদেশীর অনুকরণ বেশ ঢুকেছে—এটি প্রকাশ পায় বাইরে এলে, কিন্তু ঘরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যায় চীনাদের সেই পুরানো আচার-ব্যবহার। লিম যদিও বড়লোকের ছেলে ছিলেন কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে একজন সামান্য ব্যক্তি ছাড়া কিছু বলতে পারা যায় না। আমরা রোজই প্রায় রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত গল্প করতাম। বন্ধু লিম জাপানীদের কত পুরানো কাহিনী আমায় বলতেন —এ সব শুনে সত্যই আমি খুব দুঃখ পেতাম। এঁদের বাড়িতে কতদিন রাত্রিতে যে আমার নিমন্ত্রণ হতো তা গুণতে পারা যায় না। কত রকমের যে চীনা, পাঞ্জাবী, আর পার্শী খাবার খেয়েছি সে সবের নাম ভুলে গেলেও তাদের আস্বাদ এখনও পর্যন্ত আমি ভুলিনি। এমনি করেই আমি বিদেশে কাল কাটাতাম—মনে হতো যেন আমি সবসময়ে স্বজন-পরিবেষ্টিত হয়েই বাস করছি।

লিমের কাছে জাপানী-আমলের অনেক গল্প শুনতে পেতাম। জাপানী আমলে ওঁদের বেশ একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে হতো, তাই সব সময় জাপানীদের কথামত কাজ করতে ওঁরা বাধ্য হতেন। ভোর পাঁচটায় রোজ একবার করে টাইপিং-এর মাঠে চীনাদের ছেলেবুড়ো সকলকে হাজিরা দিতে হতো, আর জাপানী অফিসারেরা তাঁদের গুণে দেখতেন যে কেউ তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত কিনা। জাপানীরা সব সময়ই ভয় পেতো যে অনুপস্থিত ব্যক্তি হয়ত তাদের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করছে। এ রকম অনুপস্থিতির কারণ দেখাতে না পেরে অনেকে প্রাণ দিয়েছে এই জাপানী কেম্পেটাইয়ের হাতে। জাপানী কেম্পেটাইরা ছিল এক ভয়ঙ্কর জীব। এদের হাতে পড়লে জাপানীদেরও নাজেহাল

হতে হতো। এই সব অনুপস্থিত লোকদের নিয়ে যাওয়া হতো বিচার করবার জন্য টাইপিং-এর জেলে, কিন্তু তাঁদের আর কোনোদিন ফিরে আসতে কেউ কখনও দেখেনি। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে হতাশার শেষ চীৎকার বনের মধ্যে হাহাকার করে থেমে যেত। পরে যখন আমরা এদেশে এলাম, এইসব বনের মধ্যে থেকে কত-শত হতভাগ্য ব্যক্তির যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এই থেকে বেশ বোঝা যায় যে, জাপানী পুলিসের দল এদের সকলকে হত্যা করে বনের মধ্যে প্রোথিত করতো। কখনও কখনও এমনও হতো যে সামান্য সন্দেহের জন্য চীনা-পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করতে এরা কুণ্ঠিত হয়নি। কখনও কখনও সাধারণ ময়দান আর বাজারে লোকজনদের জড়ো করে দোষীদের তরবারির আঘাতে মুণ্ডচ্ছেদ করে সেই মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখতো। মরবার আগে কাকেও কাকেও বাধ্য করা হতো তাদের কবর তৈরী করতে। মৃত্যুর পরে জাপানীরা তাদের দেহ পায়ে করে ঠেলে সেই কবরে ফেলে দিয়ে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিত। মৃত্যু ছিল জাপানী আমলে একটা ছেলেখেলা। এই সব অত্যাচারিদের বৃটিশ পরে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। বৃটিশ কাকেও শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে সে দোষীই হোক আর নির্দোষই হোক তাদের জন্যে অন্তত একটা বিচারের প্রহসন করে, সরাসরি শাস্তি দেয় না। এই যেমন বিচারের প্রহসন হলো ইয়োমাসিটা আর জার্মান বন্দীদের নিয়ে। ফাঁসি হয়ত পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু দিনের পর দিন হতে লাগলো বড় বড় আইনজ্ঞদের তর্কযুদ্ধ, দয়াভিক্ষা চাওয়া, কিন্তু কিছু কি এতে হলো?—সেই পূর্বনির্দিষ্ট মৃত্যুই তাদের হলো। এরা কি সকলেই দোষী ছিলেন? পরাজিত বীরদের কি কোনো ইতিহাসে এরকম বিচার-প্রহসন কোনদিন হয়েছিল যাতে করে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিজেরা

ইচ্ছা করে মাথা পেতে নিলো? ভয়ে না ঈর্ষায় এটাই বলা শক্ত। জাপানীদের বিচার-প্রহসন বলে কিছু ছিলো না—মৃত্যু যার নির্দিষ্ট, মৃত্যু তার অবধারিত। মৃত্যুযাত্রীকে এরা পাশ্চাত্যজাতির মত তিলে তিলে হত্যা করে মারে না।

বন্ধু লিম আর সুজন সিং ব্রিটিশ আমলে যা মাইনে পেতেন, জাপানী আমলে তার ৪০ পার্সেণ্ট কম পেতেন। কিন্তু খরচ হোত বৃটিশ আমলের দশগুণ। এতে তাঁদের সংসার-চলা দুরূহ হয়ে উঠতো। তাই কালোবাজারের আশ্রয় গ্রহণ করতে এঁরা বাধ্য হতেন, অনেক জাপানী



জাপানীরা মুণ্ডচ্ছেদ করে ঝুলিয়ে রেখেছে

অফিসারেরা এঁদের সহায়তা করতেন। লাভের ফলাফল এঁদের মধ্যে ভাগাভাগি হোত। বৃটিশ কারেন্সি যাদের ছিল তারা তা রাখতে পারতো না। জাপানীরা এটা একটা বিশেষ আইনে পরিণত করেছিলো এবং এর শাস্তিও ছিল ভয়ানক। জাপানীদের একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, উচিৎ-মূল্যে বৃটিশ কারেন্সী তারা পরিবর্তন করতো, যা বৃটিশ কখনও করেনি এবং যার জন্য ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা আজ অনেকে পথের ভিখারী। বেশির ভাগ চীনারা বৃটিশ কারেন্সি, মূল্যবান গহনা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাটির ভেতর পুঁতে রেখে দিত। এমন কি গভীর বনের মধ্যে মোটরগাড়ী পর্যন্ত প্রোথিত করবার খবর মাঝে

মাঝে শুনতে পাওয়া যেত। একে মালয়বাসীরা ছিলো পরমুখাপেক্ষী সব বিষয়ে, তার ওপর এই যুদ্ধের সময় কোনো দেশ থেকে কোনো জিনিস আমদানী হোত না। এইজন্যেই এদের মধ্যে বেশ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিলো। আর এখান থেকেও রপ্তানীর স্বপ্ন এই সময়ে কেউ কখনো দেখেনি। 'খানকার রবার ও টিন, যার জন্যে মালয়দেশ বিখ্যাত, এতে একবছর কেউ হাত দেয়নি—কেননা জাপানীরা এসব জিনিস তাদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করতো না। বৃটিশ যে-সব জিনিসপত্তর ফেলে চলে গিয়েছিলো, সেইসবের সাহায্যে জাপানীরা ভেবেছিলো যে তারা শত্রুকে জয় করবে। পরে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কোনো রবারক্ষেত বন্যবৃক্ষে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে—আবার কোথায় রবারক্ষেতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—সবই ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে। টিনের খনিগুলোকে কাজে লাগাবার কথা দূরে থাকুক, টিন তোলার ড্রেজার-মেশিনগুলো নিয়ে তারা জাহাজ তৈরীর প্রয়াস পেয়েছিলো। উৎপাদনের চেষ্টা কোনদিনই তারা করেনি, যদিও সুযোগ ছিল তাদের যথেষ্ট। তারা সবসময় মনে করতো যে জার্মানী তাদের সাহায্য করবে, কিন্তু তারা তা পায়নি। আরও একটা প্রধান কারণ ছিলো যে-চীনারা টিন-মাইনে কাজ করতো তাদের জাপানীরা শত্রু মনে করে বাইরে যেতে দিত না, এবং যেসব তামিল সর্বহারার দল রবারক্ষেতে কাজ করতো তারা সকলেই নেতাজীর আহ্বানে দলে দলে আই. এন. এ-তে যোগদান করেছিলো।

সেদিন ব্যারিষ্টার বামাচরণ দাসের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি নেতাজীর অন্যান্য সেক্রেটারীদের একজন ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে বর্মা পর্যন্ত গিয়েছিলেন, পরাজিত হবার পর তিনি মালয়ে ফিরে আসেন। তিনি এখানেই বাস করছেন অনেকদিন থেকে, প্রাক্‌টিস্ করেন ইপো কোর্টে। ইপো শহর বেশ বড় ও দেখতে সুন্দর। টাইপিং থেকে এর

দূরত্ব ৬০ মাইলের কিছু বেশি হবে। তিনি বিবাহ করেছেন এখানকারই প্রবাসী এক শিক্ষিত তামিল রমণীকে। হাসপাতালে ভদ্রমহিলা অসুখে ভুগছিলেন। তাঁকে আমি একদিন দেখতে গেলাম—শুয়ে রয়েছেন একটা ধবধবে বিছানায়—পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন তাঁরই এক বান্ধবী। সেদিন আমার পরিচয় পেয়ে ভদ্রমহিলা বিশেষ আনন্দিত হলেন, তাঁর স্বামীর কাছে আমার সব পরিচয় তিনি নিয়েছিলেন। আমাকে তিনি বসতে বলাতে পাশের একখানি চেয়ার টেনে আমি বসে পড়লাম। সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার নেতাজীর সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা হলো। অসুখে শুয়ে শুয়েই তাঁর বলবার উত্তেজনাপূর্ণ ভঙ্গি আজও আমার মনে রয়েছে। কিন্তু অনেক কথা আজ আর আমার মনে আসছে না, তবে একটা কথা আমার মনে পড়ছে যে আই. এন্. এ-তে ভারতের নারীদের দান যে কত উঁচুদরের ছিল তা বলতে গেলে গর্বে আর আনন্দে সত্যই আমার বুক আজও ফুলে ওঠে। নেতাজীর অর্থের অভাব যখন এঁরা বুঝতে পারলেন তখন নিজেদের দেহের যত দামী দামী অলঙ্কার একে একে খুলে নেতাজীর পায়ের তলায় নিবেদন করেছিলেন। এইসব অলঙ্কার নেতাজী নিতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন, কিন্তু পরে এগুলিকে জমা করে রেখেছিলেন যে, যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা খরচ করে তিনি যুদ্ধ চালাবেন। কিন্তু তাঁর আর তা শেষপর্যন্ত খরচ করতে হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব অলঙ্কার পরে বৃটিশের হাতে গিয়ে পড়ে ও বৃটিশ সমস্ত গহনা স্টেটে বাজেয়াপ্ত করে।

এইরূপ এক সভায় এক অশীতিপর, পক্ককেশ তামিল বৃদ্ধ তাঁর বৃদ্ধবয়সের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে নিয়ে সভার এককোণে বসেছিলেন, কিন্তু দীন ও নিঃস্ব বৃদ্ধের কিছু দেবার ক্ষমতা ছিল না।

যখন নারীরা নিজেদের অলঙ্কার অকুণ্ঠিতচিত্তে নেতাজীর পায়ে ফেলে দিলেন তখন তিনি আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে নেতাজীকে বললেন যে, তিনি তাঁকে কিছুই দিতে পারবেন না, কারণ তিনি নিঃস্ব ও দরিদ্র, কিন্তু তিনি তার দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁকে যেন যুদ্ধে যোগদান করবার অনুমতি দেওয়া হয়। যখন নেতাজী নিরুপায় হয়ে বললেন যে, আইনত বৃদ্ধকে তিনি যোগদান করবার আদেশ দিতে অসমর্থ তখন বৃদ্ধটি নিরুপায় হয়ে তাঁর ষষ্ঠদশবর্ষীয়া কন্যার যুদ্ধে যোগদান করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সে-কটি কথা এখনও আমার মনে আছে। অশ্রুপূর্ণনয়নে বৃদ্ধ সেদিন বলেছিলেন, "নেতাজী, আমি নিঃস্ব ও দীন, ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। আমার অর্থ দেবার কোনো সঙ্গতি নেই। আমি বৃদ্ধ বলে আমার যুদ্ধে যাবার অনুমতি পর্যন্ত আপনার আইনে নিষিদ্ধ। আমার পুত্র নেই, আছে একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। একে আমি আপনার চরণতলে উৎসর্গ করতে চাই। এ প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করতেই হবে।" নেতাজী বৃদ্ধের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে তার কন্যাকে যুদ্ধে যোগদান করবার অনুমতি সেদিন দিয়েছিলেন। মেয়েটি সামান্য সৈনিকের পদ থেকে পরে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে উন্নীত হয়েছিল।

মিসেস্ দাসকে সেদিন আমি অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম কিন্তু সেজন্য তিনি কোন কষ্ট পাননি বলে মনে হলো, কেননা আমি কথা বলতে বলতে দেখেছিলাম তাঁর মুখাবয়ব ছিল আনন্দপূর্ণ। তিনি পরে ব্যবহারজীবী এন. জি. রাঘবনের কথা বললেন। তিনি ছিলেন নেতাজীর সহকর্মী। এখন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত জাভার হাই কমিশনার। এঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সেরান্বান শহরের ডাঃ মজুমদারের বাড়িতে। সেদিন আমার বেশ মনে আছে,

আমি পোর্ট ডিক্‌সন থেকে টাইপিং-এ চলেছি, পথে ডাঃ মজুমদারের বাড়ি। একবার দেখা দিয়ে যেতেই হবে, তা না হলে তাঁদের রাগের অন্ত থাকবে না, যদি কোনোদিন হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। প্রবাসে বাঙালীর কাছে বাঙালী যে কত মধুর তা প্রবাসে না এলে কেউ বুঝতে পারবে না। যদিও জানতাম যে এঁদের এখানে এলে, আমায় ক'দিনের মত এখানে আশ্রয় নিতে এঁরা বাধ্য করবেন—তবুও আমায় এখানে একবার আসতে হয়েছিলো। আমি যেতেই বাড়ির পাঁচ-ছজন ছোট ছোট মেয়ে আমায় ঘিরে ধরলো, আর মজুমদার গৃহিণীরা মেয়েদের ঘিরে বসলেন। আমার যে আজ যাওয়া চলবে না এ তাঁরা প্রথম থেকেই বলে দিয়েছেন। মেয়েদের সঙ্গে লেক্সিকন, ভূতপ্রেতের গল্প করে অনেকটা সময় আমার কেটে গেল। এর পরে কেউ গীটার হাতে, কেউ বেহালা, কেউ পিয়ানো, কেউ এসরাজ নিয়ে জাতীয় ও জাপানী সংগীত বাজাতে শুরু করে দিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বাজনা চলেছিলো। অনেকদিন পরে এই সুমধুর সংগীত সত্যই আমায় সেদিন আনন্দ দিয়েছিলো।

প্রায় ঘণ্টাকয়েক পরে মিঃ রাঘবান এসে পৌছলেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো ডাঃ মজুমদারের মধ্যস্থতায়। মিসেস রাঘবান আমাকে তাঁদের পেনাং-এর বাংলোয় একদিন যাবার নিমন্ত্রণ করলেন পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য সে আশা আমার পূর্ণ হয়নি। মেয়েটি খুব লাজুক—ডাঃ মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। মিঃ রাঘবান্‌ ছিলেন মাঝারিগোছের লম্বা-চওড়া এক তামিল ব্রাহ্মণ। চমৎকার লোক—দেশ নিয়েই পাগল। পসার এখানে তাঁর খুব ও তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে জায়গায় জায়গায় জানাতে পণ্ডিত

নেহরুর আগমনবাণী। ভদ্রলোক বেশ ক্লান্ত ছিলেন, তবু আমাদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হলো প্রায় রাত্রি দুটো পর্যন্ত। তিনি আমাকে মিলিটারীতে থাকতে উপদেশ দিলেন ও বললেন, পরে যদি দেশকে স্বাধীন করতে হয় তাহলে বৃটিশদের অস্ত্র বৃটিশদেরই বিপক্ষে নিযুক্ত করতে হবে। কথা কয়ে মনে হলো কংগ্রেস গবর্ণমেন্টকে মান্য করলেও নেতাজীর কৌশলগুলো তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গিয়েছে। অন্য কথাও বললেন। বললেন, রাশিয়ার উচিত নয় ইরাণের তৈলখনির দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া। বৃটিশ যে জাভাকে কবলিত করতে চাইছে ডাচদের সাহায্য করে, রাশিয়ার ইরাণের ওপর লোলুপদৃষ্টি তারই যে প্রতিক্রিয়া সেটা তাঁকে বলেছিলাম। কিন্তু রাশিয়ার ওপর তাঁর মন খুব বিরূপ দেখলাম। অনেকসময় তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিলো। তিনি তা যুক্তি দেখিয়ে পরিষ্কার করে আমায় সেদিন বোঝাতে পারেননি।

শোবার ব্যবস্থা কি হবে সেইটাই আমার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মজুমদার-গৃহিণী আগে থেকে আমার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রেখে দিয়েছিলেন—তাই আমার সমস্যার পূরণ হলো। এমন সুন্দর বিছানায় মালয়ে এসে এই প্রথম বোধহয় আমি শুলাম। সেজন্য এখনও মনে মনে মজুমদার-গৃহিণীকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি। মিঃ রাঘবানের স্ত্রী ও মেয়ে মজুমদার-গৃহিণীদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর মিঃ রাঘবান শয়ন করেছিলেন তাঁর বন্ধু ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে। প্রভাত হতে না হতেই আমি চলে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু মিঃ রাঘবানের গাড়ী অচল হওয়ার দরুন তিনি জীপে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর অনুরোধ সেদিন রাখতে পারিনি, কেননা, কোনো সিভিলিয়ানকে মিলিটারী গাড়ীতে চাপানো তখন আইনে নিষিদ্ধ ছিল।

মালয়ে আসবার কয়েকমাস পরে আমাদের লোকেরা এখন বেশ ছুটি পাচ্ছে। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছে কিন্তু মালয়ে আর আসবার নাম করছে না। ইউনিটে লোকজন বেশ কম হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজ চালানোও দায় হয়ে পড়ছে। সপ্তম ভারতীয় ডিভিসনের এ. ডি. এম. এস. কর্ণেল লিনিংকে এ-সব কথা জানাতে আমি বাধ্য হলাম। তিনি কোন উপায় না দেখে পঞ্চাশ জন জাপানী সৈন্যকে কাজ করতে পাঠালেন। আজকাল আমাদের মেথররা আর কাজ করতে চায় না। তারা বলে যে দেশ যখন জয় ও যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তখন তাদের এ-সব কাজ করা আর শোভা পায় না। আর তারা ত মেথর-জাত নয়, জোর করে মেথরের কাজ করতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। জাপানীদেরই এখন মেথরের কাজে লাগানো হয়েছে, মিলিটারী ও সিভিলিয়ান উভয়দের জন্য। যে কাজই এদের দেওয়া হোক না কেন এদের কোনো ক্লান্তি ও বিষাদ আমি দেখিনি, হাসিমুখে গান করতে করতে তারা কাজ করে চলেছে। পরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে এইসব মেথরদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রসন্তান ছিলেন।

পঞ্চাশজন জাপানী কয়েদীর মধ্যে একজন ছিল ক্যাপ্টেন আর তিনজন ছিল লেফটেন্যাণ্ট। ক্যাপ্টেনটি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর নাম ছিল ডাক্তার ডি. উৎসুনোমিয়া। তিনি ছিলেন মুখচোরা আর লাজুক। কথা কইবার সময় আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে তিনি কথা বলতেন। ভাল ইংরাজী তিনি জানতেন না। তিনি আমার কাছে রোজই কাজের জন্য আসতেন। কি জানি কেমন করে তাঁর ওপর আমার একটা অজ্ঞাত ভালবাসা এসেছিল—আমি তা তখন বুঝতে পারিনি।

সংসারে তাঁর বাপ-মা ও একটি ছোট বোন। তাঁর বাপ-মা দুজনেই টোকিও শহরে ডাক্তারী করেন। তাঁদের কথা মনে পড়লে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তো। বছর-দুই চিঠিপত্তরের কোনো আদানপ্রদান হয়নি। ওপরদিকে হাত দেখিয়ে বলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল আছেন। তাঁরা যে কত আগ্রহে তাঁর ফেরবার প্রতীক্ষায় আছেন সেটা তিনি আমায় বলেন। তিনি ছিলেন আমার সমবয়সী। আমি তাঁকে দুঃখ করতে বারণ করি। আমাদের হেডকোয়ার্টারের আইনে আছে যে জাপানীদের কোনো সিপাহী বা অফিসারদের কোনো সিগারেট পর্যন্ত দিতে পারা যাবে না। আমাদের দশহাত তফাতে মাথা নিচু করে তাদের কথা কইতে হবে। আমার বাংলোটির প্রতিবেশী ছিল মিলিটারী পুলিসের হেডকোয়ার্টার, অফিসার-কমাণ্ডিং ছিলেন আমার বন্ধুলোক। ডাকলে সাড়া দেন সবসময়—কি করছি, কি খাচ্ছি তাও পর্যন্ত বন্ধুটির নজরে এড়ায় না, কেননা প্রায়ই আমার মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করতাম। এ-রকম থাকা সত্ত্বেও আমি জাপানী বন্ধুকে কিছুতেই শত্রু ভাবতে পারিনি। নিজের পাশের চেয়ার এগিয়ে দিয়েছি তাঁর বসবার জন্যে—আমার পেয়ালায় চা করে তাঁকে এনে দিয়েছি। প্রথম প্রথম একটু বাধ-বাধ ঠেকতো এটা-ওটা দিতে, কিন্তু কিছুদিন যাবার পর আমি তাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে বিলাতী সিগারেট, চকোলেট, টিনের মাছ দিয়ে রুটির স্যানডুইচ্ ক'রে—এসব দিতাম। পরে এমন হলো আমি ভাল জিনিস খেলে তাঁকে না দিয়ে খেতে পারতাম না। আমার বেশ মনে আছে—তিনি তাঁর ছোট্ট একটা টিনের বাক্স পকেট থেকে লুকিয়ে বার করে আমায় দিতেন, আর আমি তাঁকে কোনো কোনো দিন খিচুড়ী ও ডিমের তরকারি করে টিনে পুরে দিতাম। তিনি পকেটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ সাবধানের সঙ্গে তা

নিয়ে যেতেন। পরে শুনতাম তাঁর কর্নেল ও তিনি কত আনন্দে সেই তুচ্ছ খাদ্যদ্রব্য ভাগ করে আহার করেছেন।

একদিন আমায় বললেন, "ডাক্তার, কতদিন যে এ-সব জিনিস আমরা খেতে পাইনি তা আপনাকে বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে,। খেয়ে



জাপানী গৃহদেবী

কত যে আনন্দ পেলাম তা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না।" এসব শুনে কি যে আনন্দ আমি পেতাম তা বুঝিয়ে ওঠা আমার পক্ষে এখন কষ্টকর। এর পরে একদিন বন্ধুটি একটি পিতলের উপর রং-করা নারীমূর্তি আমার কাছে নিয়ে এসে বললেন, "ডাক্তার, আমার ত কিছুই নেই ভাই, আপনাকে এটি যদি দিই আপনি নিয়ে আমাকে

আনন্দ দেবেন কি? আমার মা আমাকে দেশ থেকে বিদায় নেবার সময় এটি সঙ্গে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন ও বলেছিলেন যে এটি সঙ্গে থাকলে নাকি আমার কোনোদিন বিপদ আসবে না। এটি বোধহয় আমি আমার ঘরে নিয়ে যেতে পারবো না. তাই আপনাকে আমি দিচ্ছি, যত্ন করে এটিকে আপনি রেখে দেবেন।" তাঁর দান যে কত আগ্রহে, কত যত্নে আমি সেদিন নিয়েছিলাম তার আভাস আজও আমি মনে মনে বুঝতে পারি। বন্ধুর গৃহদেবী আমি আজও সযত্নে তুলে রেখেছি।

একদিন রাত্রে অসুস্থ হওয়াতে বিছানায় ছটফট করছি। যদিও রাত্রি গভীর হয়েছিল, ঘুম আমার কিছুতেই আসছিল না। সমস্ত জায়গা নিস্তব্ধ, সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কেবল বাইরে প্রহরীর লাঠির শব্দ আর তার গানের গুঞ্জন আমার কানে ভেসে আসছিল। হঠাৎ প্রহরীর 'হল্ট' শুনে আমি কান খাড়া করে রইলাম। শুনতে পেলাম আমার বন্ধুটি আমাকে দেখতে এসেছে এই গভীর রাত্রে। প্রহরী যত বলে যে সাহেবকে এখন জাগানো যাবে না—তাঁর অসুখ করেছে, বন্ধুটিও আমার খবর না নিয়ে সেখান থেকে নড়বেন না, আমি তাঁর বিপদ বুঝে তাঁকে আমার ঘরে নিয়ে আসতে অনুমতি দিলাম। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি, "ক্যাপ্টেন, আপনার গভীর রাত্রে এখানে আসা উচিত নয়—আপনারও বিপদ, আমারও সমূহ বিপদ। সকাল হলেই আসা ভাল।" আমি ভাল আছি জেনে তিনি আনন্দে চলে যান। আবার পরের দিন ভোর হতেই আমায় দেখতে আসেন। সঙ্গে আর একটি জাপানী লেফটেন্যাণ্ট জুটেছেন। তাঁর জীবন বেশিরভাগ কাটিয়েছেন আমেরিকাতেই, ইংরাজী বলেন বেশ ভালভাবেই। তিনি জাপানীদের ইন্‌টারপ্রেটার। সকল জাপানীই ত আর ইংরাজী বোঝে না বা বলতে পারে না। অনেকে বড় বড় পদ পায় শুধু তাঁদের

কাজের কুশলতায়। প্রধান সেনাপতি 'ইয়োমাসিটা', যাঁকে বলা হত 'মালয়ের বাঘ', তিনি ইংরাজী লিখতে পারতেন না বা বুঝতেনও না, কিন্তু তিনি ছিলেন রণ-বিশারদ। ইন্‌টারপ্রেটারের কাজ ছিল আমাদের মধ্যে কথার আদান-প্রদান করানো। ইনিও আমার সঙ্গে আলাপ করে ও ক্যাপ্টেনের বন্ধু জেনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করতেন। আমার ঠিকানা তিনি নিয়ে তাঁর ঠিকানা আমায় দিয়ে দিলেন—যাতে ভবিষ্যতে আমাদের বন্ধুত্ব আমরা রাখতে চেষ্টা করি। এঁদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে আমার প্রায় ভয় করতো—কেননা, সেদিন আমার পূর্বোক্ত তিনজন লেফ্‌টেনাণ্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি ছিল সতের বছরের বালক। সে ছিল ভারি শান্ত আর সরলপ্রকৃতির—যা কাজ তাকে দেওয়া হতো সে কখনও তা অবহেলা করেনি। কিন্তু সেদিন যখন আমি অফিসের কাজে হেডঅফিসে গেলাম তখন কর্নেল লিনিং আমায় জানিয়ে দিলেন যে তাঁকে স্যালুট না করাতে টাইপিং জেলে ছেলেটিকে তিনি সাতদিনের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। আমি কিছু না বলে চলে এলাম। শুধুই মনে হলো যে এ হচ্ছে বিধাতার একটা তীব্র অভিশাপ! হয়ত অন্যমনস্কভাবে কাজ দেখতে দেখতে কর্নেলের গাড়ীর দিকে তার নজর পড়েনি, তাই স্যালুট সে করেনি। মনে মনে খুব দুঃখ পেলাম। টেলিফোনে ওদের হেডকোয়ার্টারে খবরটি জানিয়ে দিলাম। ওরা ছেলেটির নাম লিখে নিয়ে আমায় ধন্যবাদ জানালো। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর জাপানী সৈন্যেরা ক্লান্ত হয়ে পড়তো। খাবার যা জুটতো তাতে তাদের পেট ভরতো না। কিন্তু কাজ যা তাদের দেওয়া হতো তার দ্বিগুণ কাজ করে দিত। এদের মধ্যে সকলেই প্রায় ছবি আঁকতে, মোটরগাড়ী চালাতে এবং গাড়ীর মেকানিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এরা সবকিছু কাজই করতে পারত। কোনো কাজ

তাদের 'জানি না' বলতে আমি কখনও শুনিনি। ওদের খাওয়ার কষ্ট দেখে আমি আমার সুবেদারকে জানিয়ে দিতাম যে যদি কোন রুটি ও তরকারী বেশি থাকে সেগুলো না ফেলে যেন ওদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সুবেদার প্রায়ই তাদের মধ্যে রুটি-তরকারী ভাগ করে দিত দেখতে পেতাম। এরা আমাদের ইউনিটে খুব ভালভাবেই ছিল বলে মনে হোত।

দুদিন ধরে আমার জাপানী বন্ধুটি আসছিল না, মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যারা কাজ করতে আসতো তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো যে ডাক্তারের ম্যালেরিয়া হয়েছে। আমি থাকতে পারলাম না, জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মেপাক্রিন আর তাঁর প্রিয় চকোলেট ও লজেন্স নিয়ে। গ্রামের একপ্রান্তে এসে দেখি ছোট একটা পুরানো কাঠের বাংলোতে একটা ছোট্ট ঘরে ছোট্ট মানুষটি জ্বরে ধুঁকছেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মেপাক্রিন তিনি নিয়মিতভাবে খেয়ে যাচ্ছেন। যদি কম পড়ে এই ভয়ে আমিও কিছু দিয়ে এলাম। চকোলেট আর লজেন্স খেয়ে তিনি খুব আনন্দ পেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কিছু খেতে চান কি না। তিনি আমায় ধন্যবাদ জানালেন এবং আর কষ্ট করতে মানা করলেন। আমি যে সেখানে গিয়েছি এজন্য তিনি আমার বিপদ বুঝে আমায় জোর করে বিদায় দিলেন। আসবার সময় দেখে এলাম বন্ধুর ছোট্ট ঘরটি। ঘরে কোথাও আসবাবের বালাই নেই, মিলিটারী ওয়াটার বট্‌লে চালিয়ে নিতে হয়। একটা কোণে একটি চৌকি ও তার ওপর সতরঞ্চি খেলবার সরঞ্জাম আর তার খাবার ঘরে খান-দুই চেয়ার, একটা ময়লা ভাঙা টেবিল। পরে শুনলাম, এদের হাতের ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন ও সমস্ত দামী জিনিস আমাদের ফৌজের দখলে গেছে।

দিন-চারপাঁচ পরে বন্ধুটি আবার এসে কাজে যোগদান করেছেন। সঙ্গে সেই ইন্‌টারপ্রেটারটি। সেদিন যখন শুনলেন যে আমি ছুটি নিয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছি তখন তাঁর মুখের অবস্থা যা হয়েছিল তা আমি বর্ণনা করতে পারছি না। তাঁর করুণ ছলছল চক্ষুদুটি এখনও আমার মনের মধ্যে উঁকি মারছে। আমার হাত ধরে কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁদের বসিয়ে কিছু চায়ের জোগাড় করলাম। বন্ধুটি কিছু খেলেন না। আমার ঠিকানা ও একটি ফটো চেয়ে নিলেন ও আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, যদি কোনোদিন জাপানে যাই, যেন প্রথমে আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠি। তিনি মনে করলেন যে এটি আমাদের শেষ বিদায়। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আবার আমি এখানে আসবো ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবো। তাঁরা তা সেদিন বিশ্বাস করতে পারেননি।

যাবার আগের দিন আমার বন্ধুটি একটি উপহার দিয়ে বললেন যে উপহারটি আমাদের দুজনের মধ্যে যেন স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সর্বদাই জাগ্রত থাকে। এটি তিনি বহুকষ্টে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কাররূপে পেয়েছিলেন। তাঁর ঠিকানা আর তাঁর একটি ফটো আমায় দিয়ে গেলেন। আমি সেদিন তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মালয়ে যদি কোনোদিন ফিরে যাই তখন তাঁর ওখানে গিয়ে আমি দেখা করবো। আমি আবার মালয়ে ফিরে গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু এমন জায়গায় আমি বদলি হয়ে গেলাম যে আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি। জানি না তাঁর সঙ্গে আমি আর মিলিত হবো কিনা। তবে যে কদিন তাঁর সঙ্গে আমি মিশেছিলাম সেই দিনকটির মধুর স্মৃতি চিরদিনের জন্য আমার মনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

কুলিমে এক রাত্রি

আগে থেকে চক্রবর্তীমশায়কে বলে দিয়েছিলাম 'কুলিম'এ একঘর বাঙালী পরিবার আছেন—তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। আর ওখানেই লাঞ্চটা সারতে হবে। সঞ্জীবচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি করে বললাম যে, বিদেশে বাঙালী মাত্রেই সজ্জন, সুতরাং আগে থেকে খবর না দিয়ে গেলেও চলবে। আমরা আলোরস্টারের মেস থেকে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। আমি ও চক্রবর্তীমশায় আমার জীপে, গুপ্ত ও মজুমদারমশায় অন্য জীপে। তাঁরা বাটাবওআর্থ দিয়ে ঘুরে যাবেন সেখানে, আমরা 'সুঙ্গি পাটানির' মধ্য দিয়ে যাব। ভোজন-বিলাসী চক্রবর্তীমশায়ের খেয়াল চাপল একটা মাছ নিয়ে 'কুলিমে' যাবেন। স্থির হলো প্রথমে আলোরস্টার শহরটা দেখে পরে বাজারে যাওয়া হবে। শহরে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। সুলতানের প্রাসাদ, মসজিদ, টাউনহল, পি. ডব্লিউ. ডি. অফিস, টাওয়ার ক্লক, সিভিল হাসপাতাল, খানকতক বড় বড় বাড়ি, দোকান-বাজার বেশ রয়েছে। শহরটা একটু বড়ই বলতে হবে তবে বড় নোংরা। পি. ডব্লিউ. ডি. অফিসের সামনে মস্ত বড় একটা পাদাং (মাঠ)। এখানে পণ্ডিতজী এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কোর্ট, পুলিস-স্টেশন, সিনেমা-হল ও প্রমোদোদ্যান সবই আছে।

আমরা বাজারের দিকে চললাম। বাজারটি বেশ বড় সব জিনিসই আছে। মালয়ীদের সংখ্যা এখানে বেশি চীনা ও ভারতীয় এখানে খুব কম। প্রত্যেক মালয়ীর টুপির মাথায় একটা করে সাদা ছোট কাপড়ের

টুকরো আঁটা—এরা যে মালয়ী ইউনিয়নের লোক এটা তারই নিদর্শন। মালয়ীদের মধ্যে এখন একটা বেশ একতা এসেছে বোঝা গেল। আগে এদের মধ্যে ঐক্যবোধ তত প্রবল ছিল না বলে চীনারা এদের নির্মমভাবে শোষণ করত। চক্রবর্তীমশায় বেশ বড় একটা ভেট্‌কি মাছ কিনে নিয়ে এলেন, দাম জিজ্ঞাসা করতে বললেন দশ ডলার মানে পনের টাকা। তাই নাকি খুব সস্তা সব জায়গার চেয়ে। ডানদিকে একটি ব্রিজ, এটা দিয়ে যাবার উপায় নেই—এটাও বৃটিশরা যাবার সময় ভেঙ্গে দিয়ে যায়। তাই আমরা আর একটা পুল পার হয়ে চললাম। নিচে দিয়ে 'কেদা' নদী বয়ে যাচ্ছে। বেশ বড় নদী, এখান থেকে মালাক্কা প্রণালী খুব কাছে। আমরা এসব ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। শহরের বাইরে বেজায় নোংরা বস্তি, দুদিকে পচা খাল সমানভাবে চলেছে।

আমরা সাড়ে ন'টার সময় 'সুঙ্গি পাটানিতে' এসে পৌঁছলাম। এখানে শহরের মধ্যে এসে সোজা বাটারওআর্থের দিকে না গিয়ে আমরা বাঁদিকে 'জালান কোয়ালাকিটিল' রোডের উপর দিয়ে 'কুলিম'এর দিকে এগিয়ে চললাম। কুলিম এখান থেকে সাড়ে তেত্রিশ-মাইল। এদিকে বাজার ও দোকানে বেশ লোকের ভীড়। কুমারের দোকান থেকে মুচির দোকান পর্যন্ত সবই এখানে রয়েছে। বাজারের বস্তিটা বড় নোংরা, বাসিন্দা সবই মালয়ী ও চীনা, ভারতীয় কম। আমরা হুড খুলে চলেছি, খুব মেঘ করেছে। বৃষ্টিও দু'এক ফোঁটা পড়ছে। দু'পাশে এবার রবার-ক্ষেত আরম্ভ হলো—লালমাটির রাস্তাটার ওপর বৃক্ষরাজি বেশ ঘন পত্রাচ্ছাদন রচনা করে রেখেছে। মাঝে মাঝে ভারতীয় কুলিদের ব্যারাক—এরা রবার-ক্ষেতে চাকরি করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়, তার পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। এদিকে শুধু রবার গাছের জঙ্গল ভিন্ন অন্য গাছপালা কিছুই নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে

আতপপাতার ছাওয়া ছোট ছোট কুটির ও ট্যাপিওকার ক্ষেত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিককার রাস্তা পিচঢালা ও খুব বেশি বাঁকা। মাঝে মাঝে এইসব রাস্তায় ভারতীয় কুলিরা কাজ করছে,—আমাদের দেখে সেলাম দেয়। এরাও সব আই. এন. এ-তে যোগদান করেছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে এরা সর্বস্ব হারিয়েছে। নেতা হতে চায়নি কিন্তু দেশের জন্যে এরা দুঃসহ দুঃখ বরণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, দেশের মুক্তিসাধনায় এরা যে ক্ষতি স্বীকার করেছে তার পরিমাণ কম নয়। এদের মুখে এখনও হাসি লেগে আছে। এদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম নেতাজীর কথা—এদের কাছে নেতাজীই সাক্ষাৎ দেবতা, অন্য দেবতার কথা এরা ভাবে না। এরা ভাল হিন্দী জানে না তবুও 'শুভ সুখ চয়নকি' গানটা গেয়ে শুনিয়ে দিলে। কি মেয়ে কি পুরুষ যখন বেরোয় তখন তারা বুকে নেতাজীর ব্যাজ পরে। ব্যাজটা এদের কাছে চরম গর্বের জিনিস, মেয়েদের কাছে বহুমূল্যবান জড়োয়া গহনার চেয়ে বেশি দামী। এরা সব তামিল কুলি। 'জয় হিন্দ্' সকলের মুখেই লেগে রয়েছে। আমরাও 'জয়-হিন্দ্' বলে চলে এলাম।

এদিকটার সব জায়গাই রবারের বন। কোথাও পাহাড়ের ওপর, কোথাও বা সমতল ভূমিতে। প্রায় দশ মাইল আসবার পর আমরা একটা খুব বড় সেতু পার হলাম। নিচে দিয়ে 'মুদা' নদী সবেগে বয়ে যাচ্ছে। বাঁদিকে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে, পাশে কতকগুলো আতপপাতায় ছাওয়া ঘর। জেলেরা নদীর ধারে জাল ফেলে মাছ ধরছে। এখানেও মালয়ীদের টুপিতে এক টুকরো সাদা কাপড় লাগানো। আমরা কিছুদূর গিয়ে একটি ছোট গাঁয়ে এসে পড়লাম। 'মারবান্ পুলাস' গ্রামটা খুব ছোট। এখানে পোস্ট-অফিস,

ছোট বাংলো আর মালয়ী ও চীনাদের সেই নোংরা পল্লী। একটা ভাঙা গাড়ি জাপানীরা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে। আমাদের দেখেই একেবারে সবাই নতশির। যে-জাত জগতের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দেখছি এখন তেমনি মাথা নিচু করতেও জানে। সামনে পেছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে সিপাই থেকে অফিসার পর্যন্ত সকলের সামনে এরা মাথা নোয়ায়, এদের জেনারেল, ক্যাপ্টেন কোনো বাছবিচার নেই। সত্যি এদের জন্য দুঃখ হয়। এরা কর্মপটু, সাহসী, দেশপ্রেমিক কিন্তু দেশের বড়কর্তাদের জন্যে এদের পরাজিত হয়ে মাথা নোয়াতে হলো।

গ্রামে বাস-সার্ভিস আছে। একটা পুল পার হলাম—পুলটি মালয়ী ১৩৪৪ সালে তৈরি হয়েছে। গাঁয়ে ফলের গাছ প্রচুর আছে। নারিকেল পেঁপে পর্যন্ত কত রকমের ফলের গাছই যে নজরে পড়ল তার আর অন্ত নেই। গ্রাম ছাড়তেই আবার সেই রবার-ক্ষেত আরম্ভ হলো। এই রবার স্টেটটার নাম 'বুকিট কারাঙ্গন'। এদিকের রাস্তা বেশ সিধা তবে খুব উঁচুনিচু। এখান থেকে কুলিম শহর আঠারো মাইল। পাহাড় কেটে এদিকে পথ বানিয়েছে। আর পাহাড়ের ওপর দু'দিকেই রবার ক্ষেত। একটা ছোট্ট নদী পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম এবং কয়েকমাইল যাবার পর 'পাদাং সেরাই'এ এসে পড়লাম। এটি একটি মাঝারিগোছের গ্রাম, এখান থেকে 'কুলিম' এগারো মাইল ও 'লুনাস' নয় মাইল। এখানে ইট কাঠে তৈরি বেশ বড় বড় দোকান ও ছোট ছোট বাড়ি আছে। অধিকাংশই চীনা ও মালয়ীদের। এখানেও বাস সার্ভিস আছে। এখান থেকে বাটারওআর্থ যাওয়া যায়। এদিকে বেশিরভাগই আতপপাতার কুটির তবে জায়গাটা খুব অপরিষ্কার নয়। এখানে একটি মালয়ী পুলিস-স্টেশন রয়েছে। পাঞ্জাবী পুলিস নেই

বললেই হয়। কেননা তারা সব আই. এন. এতে যোগদান করেছিল। এখন মালয়দেশে মালয়ী পুলিসই বেশি, চীনা একটিও দেখিনি।

আমরা গ্রামটা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। এদিকের রাস্তাটা বেশ ভালো, মাঝে মাঝে ধানক্ষেত আর নারিকেলের বাগান রয়েছে দুধারে। আমরা নয় মাইল আসার পর 'লুনাশ' নামক শহরে এসে পৌছলাম। সামনেই ইংরেজী বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামটি বেশ তকৃতকে ও ঝকৃঝকে।



মালয়ী গ্রাম

এখান থেকে কুলিম শহর আর মাইলচারেক হবে। আমরা আরও মাইলতিনেক গিয়ে এক ছোট্ট গ্রাম 'ক্লাংমালায়' এলাম—বাঁদিকে একটা বড় অট্টালিকা রয়েছে। এটি মালয় গভর্নমেণ্ট ভলাণ্টিয়ার কোর্সের জন্যে তৈরি করেছে। এটি তৈরি হয় মালয়ী সাল ১৩৫৯তে। এখান থেকে কুলিম দেড়মাইল। ডানদিকের রাস্তা গেছে কুলিমের দিকে, আর বরাবর সোজা রাস্তাটি চলে গেছে 'সেলামার' ভেতর

দিয়ে 'টাইপিং'। আমরা কুলিমের পথে চললাম। এদিকে কুমোরদের ছোট ছোট বাড়ি রয়েছে—সেখানে হাঁড়ি-বাসন তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত চোখে পড়ে। আমরা একটা ছোট পুল পার হয়ে কুলিম শহরে পৌঁছলাম। ঢোকবার মুখেই একটা বড় স্কুল রয়েছে, সব জাতের ছেলেরাই সেখানে লেখাপড়া করছে। বাঁদিকে পুলিস-স্টেশন, বেশ বড় বড় বাড়ি আর গভর্নমেন্টের অফিস। আমরা সরাসরি গুহমশায়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ছোট বাগানওয়ালা বাংলো। ভদ্রলোক বাইরে বসে অফিসের কাজ করছিলেন। বাড়ি এবং অফিস দুই তাঁর এক। আমাদের দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক নেমে এসে অভ্যর্থনা করলেন। খুব অমায়িক লোক, সর্বদাই মুখে হাসি লেগে আছে।

আমাদের বসিয়েই ভদ্রলোক স্ত্রীকে ডেকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বাজারে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বেশ জমে উঠল। ভদ্রমহিলার আলাপনে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। দুটি ছেলে আই. এন. এ-র অফিসার, একটি সিঙ্গাপুরে ও আর একটি বর্মাতে বন্দীদশায় আছেন। বড়মেয়ে শ্রীমতি ছায়া 'রানী ঝান্সী বাহিনী'তে যোগদান করবার জন্যে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। গৃহকর্ত্রী ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদানকারী তাঁর পুত্রকন্যাদের কথা বলতে যে গর্ব আর গৌরব বোধ করছিলেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। কর্তা তাড়াতাড়ি বাজার থেকে এসে আমাদের গল্পে যোগ দিলেন। অনেক কথাবার্তা হলো, জাপানীদের প্রসঙ্গও বাদ গেল না। তাঁর গোটা বাড়িটাই জাপানী সৈন্যরা দখল করে নিয়েছিল। তাঁরই বাড়িতে তাঁকে একটা ছোট কুঠরিতে দয়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির মেয়েছেলেরা সকলে অন্য এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ঘরের আসবাবপত্র সব তো দখল করেইছিল, উপরন্তু কোথাও খাট, কোথায়

খাবারজিনিসটি মা বলে রান্নাঘরের মধ্যে বসে সব খাবার রাখত। বলবার কিছু ছিল না—বললেই হিতে বিপরীত হোত। চোখ বুজে সব সহ্য করে যেতেন। পরে যখন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তিনি কুলিম-এর রিক্রুটিং অফিসার হয়ে কাজ করতেন। কুলিম তখন শ্যাম দেশের অন্তর্ভুক্ত। কুলিম শ্যামের অন্তর্গত হলেও এখানে শ্যামের 'টিকল্' চলত না, চলত জাপানী ডলার। টিকল্ চললে লোকের কিছু থাকত, কিন্তু জাপানী ডলার চলেছিল বলে, কারও ঘরে এখন টাকাপয়সা কিছু নেই।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভদ্রলোক ঘরবাড়ি ফিরে পেলেন, পৈত্রিক প্রাণটাও তাঁর বাঁচল, পেট ভরে খাবার ব্যবস্থাও হলো। তিনি বারবার বললেন যে, যদি লীগটি স্থাপিত না হোত তাহলে সিঙ্গাপুরে আর মালয়ে ভারতীয়দের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। আজ প্রত্যেক মালয়প্রবাসী ভারতীয় এই লীগের কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত নিশীথকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উঠল, তিনি পেনাংএ বন্দী ছিলেন, হালে ছাড়া পেয়েছেন। আমি ঠিকানা নিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো বলে।

খাওয়ার পরে আমরা বাইরে বসে গল্প আরম্ভ করলাম। ভদ্রলোকের মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলেন। বড়মেয়েটি বেশ বলিয়ে-কইয়ে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর সৈনিকজীবনের কাহিনী, তাঁদের কি রকমভাবে শিক্ষা দেওয়া হোত, এই সমস্ত বলতে শুরু করলেন।

সিঙ্গাপুরে উড্ স্ট্রীটে মেয়েদের শিবির ছিল। মিসেস্ থিবীর ছিলেন সেখানকার অফিসার কমাণ্ডিং। এই শিবিরে সব মেয়েদেরই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হোত। এঁদের ভোরবেলা উঠে মুখহাত ধুয়ে হাফপ্যান্ট

পরে শরীরচর্চা করতে হোত ঘণ্টাদুয়েক। তারপর চালের প্রাতরাশ. সমাধা করবার পর তাদের প্যারেড করতে হোত ঘণ্টাতিনেক। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন—শুধু ভাত আর ডালের জল। দেশের মুক্তিসংগ্রামে এদের এই কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী শুনে, ভারতবাসী আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। মেয়েটি বলে চললেন, তাঁদের সৈনিক-জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কথা। মধ্যাহ্নভোজনের পর বেলা তিনটা পর্যন্ত নাকি বিশ্রাম করবার সময়। তারপর আবার প্যারেড, খেলা, শেষে ছুটি। ছুটির সময়টাতেও মাঝে মাঝে গুলিছোঁড়া অভ্যাস করতে হোত। শিবিরের বাইরে যাবার কোনো নিয়ম ছিল না, তবে যদি কোনো আত্মীয় আসেন তাহলে সে অন্যকথা। বুটপট্টি ও হাফ প্যাণ্ট কিংবা ফুলপ্যাণ্ট পরে সবসময় তাঁদের থাকতে হোত। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এখনও সেইসব জিনিস স্মরণচিহ্নস্বরূপ সযত্নে রক্ষিত আছে। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে মেয়েদের গান গাইতে অনুরোধ করলাম। বড়মেয়ে শ্রীমতী ছায়া গান জানেন না সেজন্য অন্য তিনটি মেয়ে 'শুভ সুখ চয়নকি' ও 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' দুটি গান আমাদের শোনালেন। গানের পালা শেষ হলো, আমরা সবাই চুপচাপ বসে আছি —এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা, খর্বকায় ও জীর্ণশীর্ণ একটি ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। ভদ্রলোকের হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ—বুকে নেতাজীর ফটো আঁটা রয়েছে। বৃষ্টি মাথায় করেই তিনি এসেছেন, তাঁর জামা-কাপড় সব ভেজা। তা সত্ত্বেও তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। সদানন্দ মূর্তি, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। গুহমশায় আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন: ইনিই সেই বাঁড়ুজ্যেমশায়— সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন। আমার নসীব একথা বলতেই হবে। সকলের পীড়াপীড়িতে সেদিন আমাদের আর টাইপিংএ ফেরা হলো না।

বাঁড়ুজ্যেমশায়ের সঙ্গে আই. এন. এ-সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। আই. এন. এ-র অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় আজাদ-হিন্দ্ স্কুলের তিনি ছিলেন ডিরেক্টর। নেতাজী তাঁকে রেঙ্গুন থেকে এখানে আনেন। রেঙ্গুনের অনেক গল্প বললেন। সেখানে কর্নেল চ্যাটার্জীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্যের কথা বললেন; যাকে কর্নেল চ্যাটার্জী প্রাইভেট সেক্রেটারি করতে চেয়েছিলেন। নেতাজীর নিয়ম ছিল যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেক মেয়েদের রানী ঝান্সী বাহিনীতে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, সেজন্যে শ্রীমতী গৌরীকে কোনো কাজ দেওয়া হলো না। এজন্যে নেতাজীর সঙ্গে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের নাকি একবার খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল—কিন্তু নেতাজীর কথা তাঁকে মেনে নিতে হয়। ঝান্সীবাহিনীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় শ্রীমতী গৌরী প্রথমেই ফ্রণ্টে যাবার অনুমতি পান। তখন প্রথম কে যুদ্ধে যাবে এর জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা হোত।

বাঁড়ুজ্যেমশায়ের কথা শুনে এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রবাসী বাঙালী মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। 'রেঙ্গুন রিভিউ' বলে একটা পত্রিকা ঘটনাক্রমে দিনকয়েক আগে আমার হাতে এসে পড়ে— সম্পাদিকার নামটি হচ্ছে বেলা মুখার্জী। একজন বাঙালী মেয়ে প্রবাসে একটি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা করছেন এতে আমি গর্ব অনুভব করেছিলাম। বাঁড়ুজ্যেমশায়কে বেলা মুখার্জীর নাম বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি এখন কোথায়?" জবাব দিলাম যে, "টাইপিংএ। শুনেছিলাম মিঃ কানন পিলে সেখানে এসেছেন সেজন্যে তিনি 'রেঙ্গুন রিভিউ'এর সম্পাদিকা হয়েছেন ও সেইখানেই বাস করছেন।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাঁড়ুজ্যেমশায়

বললেন "ও একটি যন্ত্র, আমার ডানহাত ছিল ডাক্তারবাবু। বেলা আমার মেয়ের বয়সী—তখন বেলা না হলে সবদিক দিয়েই আমি অচল হয়ে পড়তাম। আমাকে জোর করে ও ওর কাগজের জন্যে লেখাত। লিখতে আমার চিরকালই আলস্য। বেলা আমার বক্তব্য বিষয় শুনে গিয়ে নিজেই লিখত। এখন সে কাছে নেই—আমায় নিজেকেই লিখতে হয়।" অবশেষে বাঁড়ুজ্যেমশায় নেতাজীর প্রসঙ্গ শুরু করলেন, বললেন, জাপানীদের আত্মসমর্পণ করবার পর নেতাজী যখন সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাবার তোড়জোড় করছেন তখন একদিন তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়। তিনি নেতাজীকে রাশিয়ায় যেতে বলেন. কিন্তু নেতাজী তখন বলেন "বাঁড়ুজ্যেমশায় রাশিয়া ত আমায় ডাকেনি আমি সেখানে যাব কেন?" নেতাজীর কথা বলতে বলতে বাঁড়ুজ্যেমশায়ের হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—আমাদের সামনেই ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। চোখ মুছে বললেন "এখন নেতাজী কোথায় আছেন—কেমন ভাবে আছেন? হয়ত তাঁর সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু নেই, হয়ত তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কোনো অজানা পথে এগিয়ে চলেছেন—পথে কত কষ্ট পাচ্ছেন।" তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ কথাগুলো আমার মনকে প্রবল নাড়া দিলে—সেই পক্বকেশ বৃদ্ধের চোখে জল দেখে আমার চোখও সেদিন শুষ্ক থাকেনি। আমি বললাম, "যতদূর জানা যায় নেতাজী বিমানদুর্ঘটনায় মারা গেছেন।" তিনি চমকে উঠে বললেন "ডাক্তার বাবু, তিনি বেঁচে আছেন, তিনি মরেননি, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরতে পারেন না। তাঁর মত সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক মহান নেতা কোনো দেশে জন্মাননি। তিনি কখনও পিছনে পড়ে থাকতে চাইতেন না—চলার মন্ত্রই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।"

পাহাড়ের পথে

কাল ৪ঠা এপ্রিল পাহাড় যাবার দিন স্থির করেছি। সেখানে ম্যালেরিয়া সার্ভে করতে হবে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাতে পারলে ভোরবেলাই সঙ্গী শোনপিটারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। এখন এপ্রিল মাস, টাইপিং-এর ডাক বাংলোয় শুয়ে আছি। এসময় ভারতে এত গরম পড়ে যে সমস্ত রাত্রিটাই জেগে কাটাতে হয়। এখানে কিন্তু এখন এত শীত পড়েছে যা বলবার নয়। বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর তার সঙ্গে বাতাসের ফোঁসফোঁসানি লেগেই আছে। কখনও দমকা হাওয়া আমার পাশের খোলা দরজাটায় এসে আঘাত করছে। পাশের ঝরণার জলের শব্দটা এত কষ্টদায়ক হয়েছে আজ, তা কহতব্য নয়। রাত্রে যে নিদ্রা আসবে না এটা নিশ্চিত। আমার চাকর শোনপিটারটা পাশের ঘরে বেশ নাক ডাকাচ্ছে—লোকটা বেশ সরল ও কর্মঠ। নামটা শুনলে মনে হবে ক্রীশ্চান। তা মোটেই নয়—আমারও ভুল হয়েছিলো প্রথম আমি যখন এখানে আসি। তারপর তার নামের ইতিহাসটা সে আমায় একদিন শোনালে। তার আসল নাম ছিল শোভান, বাস করত যুক্তপ্রদেশের কোনো এক মুসলমান-পল্লীতে। সে যুদ্ধে আসবার কিছুদিন আগে কোন জায়গায় ফিটারী-সংক্রান্ত কাজে যোগদান করে। যুদ্ধে যখন সে নাম লেখায় রিক্রুটিং অফিসারের কাছে সে তার নাম বলে শোভান ফিটার। তার ইচ্ছা ছিল যে রিক্রুটিং অফিসারটি তাকে ফিটারি সংক্রান্ত কাজে ভর্তি করে নেন। কিন্তু অফিসারটি ছিলেন একজন বৃটিশ—তিনি নাম শুনে

লিখে নেন শোনপিটার। শোন পিটার নামের এইটাই হলো সম্পূর্ণ ইতিহাস।

ভোরবেলাই কিছু জলযোগ করে পুরোনো বেডিংটা নিয়ে জীপে করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কোথাও যেতে হলে পথে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান পড়ে সেগুলো দেখে এগোনো আমার অভ্যাস। পাহাড় যাবার পথেও মালয়ের সেই একই দৃশ্য, সেই রবার-ক্ষেতের সারি, না হয় ক্ষেত আর পাহাড়। তবে এদিকটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে টিনের খনি। এই অঞ্চল পেরাক-রাজ্যের অন্তর্গত। আয়তন ৭,৮০০ বর্গমাইল। আমরা এর রাজধানী কোয়ালা কাংসর হয়ে গিয়েছিলাম। এখানে দ্রষ্টব্য জিনিসের মধ্যে পেরাকনদীর ধারে শহর থেকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে সুলতানের চকমিলানো প্রাসাদ ও একটি প্রকাণ্ড কারুকার্য খচিত মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে গ্রীক নামক শহরে যাবার পথে পেরাকনদীর তীরে একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক যন্ত্রের জন্য একটি পাওয়ার হাউস বসানো হয়েছে। সেখান থেকে আশেপাশের শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই শহর ছাড়িয়ে অর্ধমাইল যাবার পর পেরাকনদীর ওপর একটা সেতু পার হলাম। এটি দেখে ভারতের লছমোনঝোলার কথা মনে পড়ে গেল। নিম্নে বর্ষার বারিধারার প্রাচুর্যে স্ফীত প্রবল বেগবতী পেরাকনদী সগর্জনে বয়ে চলেছে। নদীটির উভয়-তীরই জঙ্গলাকীর্ণ, তার পেছনে সুদূর প্রসারিত পাহাড়ের মালা। বৃটিশরা যাবার সময় এই নদীর ওপর আগের যে সুদৃঢ় সেতুটি ছিল সেটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে চলে যায় কিন্তু পরে জাপানীরা একটা কাজ-চলা-গোছের কাঠের সেতু তৈরী করেছে। এর ওপর দিয়ে চলা খুবই দুষ্কর ও বিপজ্জনক। আমরা অনেক অরণ্য ও পর্বতের পাশ দিয়ে 'ইপো' শহরের দিকে চললাম। এদিকে যেতে

একটা রাস্তা তাজ্জম্ রম্বুত্তানে চলে গেছে। এখানে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার জন্তে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। মালয়বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ মস্তিষ্কের গোলমালে এত ভীষণপ্রকৃতির হয় যে, স্বজন ও রাস্তার লোকদের হত্যা করে। ইংরাজীতে এ রোগকে বলে 'রানিং এম্যক'। মালয়ে এ-রোগটির প্রাবল্য আছে। এখান থেকে 'ইপো' শহর খুব নিকটবর্তী। এ শহরটি এ-প্রদেশের



টিনের খনি

অন্যান্য শহরের চেয়ে বড়, এর আভিজাত্য-গৌরব আছে। এখানে দু-একঘর বাঙালী পরিবার থাকেন। তাঁরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, ও কেউ পোস্ট অফিসে চাকরি করেন। পোর্ট ডিকসনের গুপ্ত মশায়ের কথামত কয়েকটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। খুঁজে খুঁজে প্রথমে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর হারাণ দাস মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির

হয়। তিনি ইম্ফলের নিকট যুদ্ধ করতে করতে প্রকৃত বীরের মত হাসিমুখে অন্তিমশয্যায় শয়ন করেন। তাঁর স্ত্রী এখনও কয়েকটি ছেলে মেয়ে নিয়ে অতিকষ্টে দিনপাত করছেন। সেখান থেকে আমি সেনগুপ্ত পদবীধারী জনৈক পরলোকগত বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার নাম অণিমা। এরাও খুব কষ্টে আছে দেখলাম। শুনলাম অণিমার বাবাকে চীনারা একদিন ডেকে নিয়ে যায়। সে-সময় সারা দেশটায় একটি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো যা অরাজকতারই নামান্তর। যাদের ওপর চীনারা বিরূপ ছিল জাপানী আমলে তাদের ওপর কোন অত্যাচার করবার সুযোগ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এখন তারা দেশের এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করছে। অনিমা বললে যে তার মা চীনাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাদের অনেক কাকুতিমিনতি করেছিলেন, কিন্তু কিছু ফল হয়নি—চীনারা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়নি। পরে প্রায় মাস-দুয়েক আর তাঁর কোনো খোঁজ খবর তারা পায়নি এবং বৃটিশরা চেষ্টা করেও কিছু সন্ধান দিতে পারেনি। আমি কোনো বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মুখে জানতে পারি যে-দিন তাঁকে চীনারা ধরে নিয়ে যায় সেইদিনই রাত্রে তাঁকে একটি থলের মধ্যে পুরে কোন ভারী জিনিসের সাহায্যে তাঁর মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করে হত্যা করে ও পরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ প্রোথিত করে ফেলে। চীনারা এখন এত প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেছে যে শত্রুর ওপর শোধ তুলতে গিয়ে তারা যে-কোনোরকম অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করতে অনুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না। সেদিনকার খবরের কাগজে দেখলাম চীনা গরিলার দল একজন বৃটিশ অফিসারকে ধরে নিয়ে গ্রীকের জঙ্গলে বন্দী করে তাঁকে শাসিয়ে বৃটিশজাতির ভীতি-উৎপাদনের প্রয়াস পাচ্ছে। এসব এখন

হামেশাই হচ্ছে। রাস্তায় বেরুবার সময় মাঝে মাঝে ভয় হয় কিন্তু এই ভ্রমণের নেশা আমায় এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে বিপদ নিশ্চিত জেনেও পথে না বেরিয়ে পারি না।

ইপো ছাড়িয়ে অপাশহরের ৪০ মাইলের ভিতরে আর একটা উঁচু পাহাড় পড়ে, সেটা হচ্ছে ক্যামেরন হাইলাণ্ড। পাহাড়টি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু। এর ওপর ছবির মত সুন্দর শহরটি—ধনী ব্যক্তিরা বায়ু পরিবর্তনের জন্যে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। পাহাড়ের ওপর-কার একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে এখানে পৌছতে হয়। দু'পাশে সারবাঁধা বনস্পতি সমূহ দাঁড়িয়ে। বনের ভেতর একটা ঝরণা কুলুকুলু শব্দ করতে করতে নিম্নাবতরণ করছে। এ রাস্তাটি এত সঙ্কীর্ণ যে একসঙ্গে একটা গাড়ী যেতে কিংবা আসতে পারে। গাড়ী যাবার ও আসবার একটা বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা আছে। এখানে রাঠোর নামক একজন ভারতীয় যুবক 'টেগোর ডানসিং সেণ্টার' বলে একটি নৃত্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

এদিন পাহাড়ের পথে না গিয়ে আমি সোজা কোয়ালা-লামপুরে রবিবাবুর বাড়ি উঠলাম। এখানে একদিন থেকে আমি এখানকার বিখ্যাত কয়লার খনি বাতু আরাং দেখতে গিয়েছিলাম। বাতু আরাং যেতে হলে টাইপিংএর পথে কয়েকমাইল গিয়ে অন্য রাস্তা ধরতে হয়। রাস্তাটি মালয়ী বস্তির মধ্যে দিয়ে গেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পিচঢালা রাস্তা নয়। ধুলো উড়িয়ে বেশ ক'মাইল যেতে হলো। এখানে দেখবার মধ্যে আছে জাপানীদের একটি হাসপাতাল। এটি একটা ভাঙ্গা কারখানাতে স্থাপিত হয়েছে। নার্স ও ডাক্তারদের দেখলাম। নার্সরা সব কাজই করছেন। কেউ সাবান দিয়ে কাপড় কাচছেন, কেউ রান্না করছেন, কেউ বা জল নিয়ে ঘরে যাচ্ছেন। কয়েকজন রোগীদের

কাছে গিয়ে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছেন। বেশিরভাগ নার্সই অল্পবয়স্কা। আমাদের দেখে পা দুটো যুক্ত করে মাথা নোয়ালেন। একটি ডাক্তারকে ডাকতে তাঁদের মতই ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন। দেখে মনে হলো নার্সেরা সকলেই বেশ আনন্দে আছেন। হাসপাতালটি থেকে আমি কয়লাখনি দেখতে রওনা হলাম। খনির পাশে দোকান আর চীনা, মালয়ী ও ভারতীয় শ্রমিকদের ছোট ছোট ঘর ধুলায় ধূলাময়। পাশেই একটা ঘরে চীনা পাঠশালায় চীনা গুরুমশাই বেত হাতে করে ছেলেদের পড়াচ্ছেন আর কখনও কখনও টেবিলের ওপর বেতের প্রবল ঘা মেরে আস্ফালন করছেন। এখানকার কয়লার খনিটি খুব ছোট। প্রকাণ্ড খাদ কেটে ক্রেনের সাহায্যে কয়লা তোলা হচ্ছে। জল যেখানে বের হয়ে সেখানে একটা জল-নিষ্কাশন যন্ত্র রয়েছে। তার সাহায্যে জল ওপরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শুনলাম আশেপাশের সব জায়গা কয়লায় ভর্তি। যথাসময়ে একটু একটু করে তোলা হবে। এখানে বেশিরভাগ লোক কাঠের আগুনে রান্না করে, সেজন্য কয়লার চাহিদা খুব কম। এসব দেখে শুনে আবার রবিবাবুর বাড়িতে ফিরে এসে আশ্রয় নিলাম।

ভোরে উঠেই আমরা পাহাড়ের পথে পাড়ি দেবার মনস্থ করলাম। সকলেই বললেন যে এটা একটা বিপদসঙ্কুল রাস্তা, আমরা যেন সাবধানে যাই। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে কোয়ালাকুবু বাহারু নামক একটা শহর হয়ে আমাদের পার্বত্যপথে অগ্রসর হতে হবে। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল কোয়ালা লিপিস। এখানে শুধু অভ্রভেদী পাহাড়। এই পাহাড়ের ওপরকার আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে আমাদের প্রায় আশি মাইল যেতে হবে। সেজন্য টায়ার টিউব পরীক্ষা করে আর পেট্রলের কটা টিন ভর্তি করে আমরা বের হয়ে পড়লাম।

: ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা কোয়ালাকুবু বাহারুতে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে সর্পিল পাহাড়ী পথ বেয়ে আমাদের জীপ ক্রমশ পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলো। এদিকে মাঝে মাঝে রাস্তা মেরামতের জাপানী শ্রমিক ছাড়া অন্য লোকজন বড় একটা নজরে পড়লো না। প্রায় ঘণ্টাতিনেক পরে আমরা মাত্র চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। এত সরু পথ যে পাশাপাশি দুটো গাড়ীর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। এ রাস্তায় ফ্রেসার হিল নামক স্থানটা যেমন মনোরম তেমনি স্বাস্থ্যকর। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চারহাজার ফুট উর্ধ্বে। এখানেও যাবার একটিমাত্র রাস্তা, তাও আবার সবসময় খোলা থাকে না। পার্বত্যপথে গাড়ী চালিয়ে আমরা শহরে পৌঁছলাম। এখানে বেশ শীত পড়েছে। স্থানীয় একটি লোককে গাইড করে আমরা সমস্ত পাহাড়টি ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ওপর কোথাও হাসপাতাল, কোথাও বা ক্রিকেট আর ফুটবল খেলবার মাঠ আবার কোথাও বা ছোট-বড় সারি সারি সুন্দর অট্টালিকা আর তৎসংলগ্ন উদ্যানে পুষ্পের প্রাচুর্য। সামনেই একটা ছোটখাটো ডেইরী রয়েছে। ভারতীয়দের কতকগুলি দোকানে চাল-ডাল বিক্রি হচ্ছে। এখানেও ভারতীয় কুলি প্রচুর। এখানকার ভারতীয়রা আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করে হাজারটাকার জাপানী নোট খানতিনেক উপহার দিলেন। আসবার পথে পোলোখেলার প্রকাণ্ড মাঠের আশে পাশে কতকগুলো স্বাস্থ্যনিবাস নজরে পড়লো। পর্বতগাত্র বন্ধুর ও চারদিক উচ্চাবচ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে পর্বতগাত্রে শুভ্র মেঘখণ্ডসমূহের আনাগোনা দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। ওপরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, পাহাড়ে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার আর অন্ত নেই। কখন রোদ উঠবে আর কখন যে বৃষ্টি হবে

সেকথা কেউ বলতে পারে না। এই হয়তো দেখা গেলো প্রখর সূর্যালোকে পাহাড় ঝলমল করছে, পরক্ষণেই হয়ত প্রচণ্ড বারিবর্ষণে পাহাড়-বন-আকাশ সব একাকার হয়ে গেল। এদেশের লোকদের এ সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এরা রোদবৃষ্টির তোয়াক্কা রাখে না। এখানে বাঙালী নেই, চীনাদের সংখ্যাই বেশি দেখলাম।

এখান থেকে নেমে এসে কোয়ালা-লিপিসের পথে পাড়ি দিলাম। এবার পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল। কোথাও হয়তো পাহাড় দুশো ফুট উর্ধ্বে উঠে গেছে। তার শীর্ষদেশে পৌছেই দেখা গেল নিচে একশোফুট গভীর উৎরাই। এমনিভাবে দুর্গম দুরারোহ পার্বত্যপথে চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে জীপ চালিয়ে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম—আশেপাশে গভীর বনানী, দূরে তুঙ্গ গিরিচূড়াসমূহ অভ্রভেদ করে উঠেছে। দীর্ঘ গিরিপথ অতিক্রম করে অবশেষে আমরা এক সমতল স্থানে পৌছলাম। এদিকে দুটো রাস্তা আছে—ডাইনের রাস্তাটায় গেলে বেণ্টং নামক গ্রামের মধ্য দিয়ে কোয়ালা-লামপুরে যাওয়া যায়। এ-পথটিও অতি দুর্গম আর সোজা গেছে 'রব' নামক শহরে। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের কোয়ালা লিপিস যেতে হয়েছিলো। রব শহরটি ছোট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখান থেকে মাইলদুয়েকের মধ্যে একটা সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, এটি অষ্ট্রেলিয়ানদের সম্পত্তি। বৃটিশরা এটাকে বিধ্বস্ত করে চলে যায়—এখন এটা জলমগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। মালয়ের এ-অঞ্চলটি সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। গোড়ায় বৃটিশরা এদিককার খনিজসম্পদ আহরণে বিশেষ উদ্যোগী হয়নি। এখন কিন্তু তারা সোনা আবিষ্কারের জন্যে পূর্ণোদ্যমে তোড়জোড় করছে শুনলাম।

এরপর থেকে শুরু হলো মাইলের পর মাইল জুড়ে সমতলভূমি।

বেনটা থেকে একটা রাস্তা দক্ষিণ চীনসাগরের ধারে কোয়ানটা নামক মালয়ী শহরে চলে গেছে। আমাদের প্রচুর সৈন্য এখানে অবস্থান করছে। কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন এসব জায়গায় গিয়ে বেশ কাজ করেছে। এদিকে পেকান নামে ছোট্ট একটি শহর আছে—এইটাই পাহাঙের সুলতানের রাজধানী। এদিককার পথ বড় দুর্গম। প্রায় রাত্রি দশটায় আমরা কোয়ালা লিপিসে পৌঁছলাম। আগে এখানে পাহাঙের বৃটিশ রেসিডেণ্ট থাকতেন কিন্তু এখন এটি আমাদের একটি



মালয়ী গরুর গাড়ী

সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটিবিশেষ। শহরটির একপ্রান্ত দিয়ে একটি বড় নদী দক্ষিণ চীনসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। শহরটির অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় অল্পবিস্তর রয়েছে। পাহাড়ের ওপর অল্পপরিসর স্থানে আমাদের হেডকোয়ার্টার্স, পাশে হেলথ অফিস ও মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। পূর্বে এখানে একটি রেলপথ ছিল, এটি কোটাবারু হয়ে বরাবর চলে গিয়েছিল মালয়ের

পশ্চিমদিকে। কিন্তু এ রেলপথটি জাপানীরা তুলে নিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার সুবিধার জন্যে শ্যামদেশে নূতন রেলপথ তৈরী করে। এই রেলপথটি রেঙ্গুনে মিলিত হয়েছে।

কোটাবারু কেলানটন-রাজ্যের রাজধানী। এটিও দক্ষিণ চীন সাগরের ধারে অবস্থিত। এদিককার মাছের কারবার বেশ বিখ্যাত। এখান থেকে শুটকিমাছ মালয়ের নানা জায়গায় চালান যায়। বৃটিশের একটি বিমানঘাঁটি এখানে আছে। এ-অঞ্চল থেকে আয়ের পন্থা আবিষ্কার করা যায় কিনা সেজন্যে গোড়ায় বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা বুঝতে পারলে যে, অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে শহর বসিয়ে কোনো লাভ নেই, তখন সে চেষ্টায় তারা বিরত হলো। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে দু একটা হাসপাতাল আছে, তাতে চিকিৎসাকার্য সম্পাদনের প্রাথমিক ব্যবস্থা আছে মাত্র। কোটাবারুতে ইংরাজেরা একটা বিমানঘাঁটি তৈরী করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল জাপানকে মিথ্যা ভয় দেখানো। যাতে তারা এ অঞ্চলে আক্রমণ না চালায়। মালয় অধিকার করতে জাপানের আসা সুবিধাজনক ছিল চীনসাগর হয়ে মালয়ের পূর্বদিক থেকে। এখানে ইংরাজের বিমানঘাঁটি থাকলেও সৈন্যসামন্ত বেশি ছিল না; সেটা বুঝতে পারা গেল গত মহাযুদ্ধে জাপানের কোটাবারু ও সেনগোরার প্রথম অভিযানে। এখানকার অধিবাসীর কাছ থেকে অবগত হই যে পূর্ব থেকেই নাকি এসব প্ল্যান তাদের করা ছিলো ও মালয়ের প্রত্যেক জায়গায় জাপানী গুপ্তচররা ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে মালয়ের পথঘাট অন্ধি-সন্ধি সবই ছিলো জাপানীদের নখদর্পণে। এই জন্যেই সামান্য চেষ্টায় জাপানীরা মালয় অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলো। বৃটিশের সামান্যমাত্র সমরোপকরণও যাতে না তাদের

হাতছাড়া হয়ে যায় সেদিকে গোড়া থেকেই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। জাপানীরা এদিকা দিয়ে মালয়ে অবতরণ করলেও, এখানকার অধিবাসীদের ওপর নাকি তিলমাত্র অত্যাচার হয়নি—অবশ্য চীনাদের কথা আলাদা। চীনাদের ওপর সর্বত্র সর্ব অবস্থায়ই তারা ত সমান ভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। প্রথম যে জাপবাহিনীটি মালয়ে এসে হানা দেয় সেটির নাম মরণ-পণ বাহিনী। তারা দুর্গম অরণ্য ও আকাশভেদী পর্বত পার হয়ে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে এসে আক্রমণ চালায়। এরা সোজাপথে না এসে এসেছিল ঘুরপথে, সে জন্যে বৃটিশবাহিনী অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলো। জাপানীবাহিনীর অনেক যোদ্ধা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল বটে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মরতে হয়েছে মালয়ের মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে আর ভীষণাকৃতি বিষধর সর্পের দংশনে। ইংরেজদের যেমন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে ধীরে-সুস্থে কাজ করা অভ্যাস, জাপানীদের কিন্তু সে রকমের ধাত নয়। এদের মধ্যে হঠকারিতা অত্যন্ত প্রবল। এরা চট করে সিদ্ধান্তে পৌছোয় এবং এমনভাবে বিচার-বিবেচনা না করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত হয়।

মালয়ের কথা

মালয় দেশটি নেহাৎ ছোট নয়, আয়তন প্রায় বাংলাদেশের কাছাকাছি। এটা ষড়ঋতুর দেশ নয়, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এখানকার প্রধান ঋতু। বর্ষা এখানে লেগেই আছে, তবে দুই-তিন মাস গ্রীষ্মাধিক্য হয়। বৃষ্টিপাত বেশি হয় বলে যে বর্ষায় পল্লীগুলো জলমগ্ন হয় তা নয়। শহরের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দিকে এদেশের স্বাস্থ্যরক্ষাবিভাগ আর মিউনিসিপ্যালিটির সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এ-দেশের সর্বত্র পিচঢালা রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া ও লম্বা। এশিয়ার অনেক দেশে এরকম রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে সর্বশুদ্ধ আটহাজার মাইল রাস্তা ও একহাজার মাইল রেলপথ আছে।

বৃটিশরা গোটা দেশটাকে ফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়, আনফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয় আর স্ট্রেট সেটেলমেণ্ট অফ মালয়, এই তিনভাগে বিভক্ত করেছে। ফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়ের মধ্যে আছে চারটি বিভাগ—নেগ্রিসেম্বিলন, সেলাঙ্গর, পাহাং ও পেরাক। আনফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়ের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ—জোহর, কেদা, পার্লিস, কেলানটন ও ট্রেঙ্গানু। আর স্ট্রেট সেটেলমেণ্টের মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অঞ্চল—সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ও ওয়েলেসলি প্রদেশ। পেনাং শহরটি ওয়েলেসলির মধ্যে পড়ে। ডিনডিং বলে আরও একটা অঞ্চল এর মধ্যে ছিল সেটা এখন পেরাকরাজ্যের অন্তর্গত। মালয়দেশের পশ্চিমভাগ সবচেয়ে বেশি উন্নত, এখানকার জমিও খুব উর্বর। পূর্বভাগ অনুন্নত ও অনুর্বর।

এদিকে অধিকাংশ স্থানই বড় বড় পাহাড় আর জঙ্গলে ভর্তি। নিচে স্টেটগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

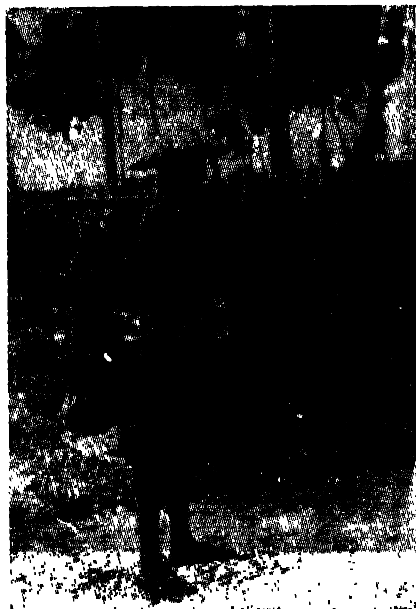
ফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরা নেগ্রিসেম্বিলন, সেলাঙ্গর, পাহাং ও পেরাক এই চারটি স্টেট সম্মিলিত করে ফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয় এই নাম দেয়। সবকটা দেশই বৃটিশের রক্ষণাধীনে আছে। এগুলির শাসনকার্য ইংরেজ রেসিডেন্টের নির্দেশে পরিচালিত হয়। একই আইন ও একই গভর্ণমেণ্ট দ্বারা এই চারটি রাজ্য শাসিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক স্টেটেই একজন করে স্বলতান আছেন এবং বিচারাদি করে থাকেন। রেসিডেণ্ট অবস্থান করেন কোয়ালা-লামপুরের গভর্ণরের অধীনে।

নেগ্রিসেম্বিলন

এটি মালয় দেশের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২,৫৫০ বর্গমাইল। এর মধ্যে সেরানবান পাহাড় ঘেরা ছবির মতন ছোট্ট একটা শহর। এখান থেকে মালয়ের সবজায়গায় যাওয়া যায়। এ দেশের রাস্তা এত ভাল যে এখানে মোটরে ভ্রমণ খুবই আরামের। পোর্ট ডিকসন আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান, সেরানবান শহর থেকে এটি বিশমাইল দূরে মালাক্কা প্রণালীর ধারে অবস্থিত। এখানে একটি ছোট বন্দর আছে। বড় বড় জাহাজ সময় সময় যাতায়াত করে। সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলে দেখা যায় প্রণালীর জলে কোথাও জেলেরা পাগারে (বাঁশের তৈরী একপ্রকার বেড়াজাল) মাছ ধরছে—কোথায় চীনা, মালয়ী ও ভারতীয় ছেলেরা স্নান করছে। ঢেউয়ের জল প্রণালীর তটে প্রতিহত হয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে।

সমুদ্রের অনন্তপ্রসারিত নীল বারিরাশি সুদূর দিগন্তে নীলিমায় গিয়ে বিলীন হয়েছে। তটভূমিতে আশেপাশের ছোট ছোট পাহাড়গুলির উপর চীনাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাংলোগুলি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে মালয়ী সৈন্যদের সামরিক বিদ্যালয় ও হেডকোয়ার্টার।



মালয়ী জেলে

সেরানবান ও পোর্ট ডিকসন শহরে চীনাদের সংখ্যা খুব বেশি, তারপর মালয়ী, ভারতবাসী। এই দুই শহরে বহু বাঙালী পরিবার বাস করেন। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল, প্রায়ই আমি তাদের দেখতে যেতাম। যুদ্ধের সময়

তারা সকলেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বালক-সেনা ও বালিকা-সেনার দলে ভর্তি হয়েছিল। তারা নিজেদের সামরিক জীবন সম্বন্ধে আমাকে কত গল্পই যে বলত তার আর অন্ত নেই। তাদের মুখে নেতাজীর কথা, তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার কথা ইত্যাদি শুনে আমি প্রচুর আনন্দলাভ করতাম। আমি একদিন আমার রিভলভার দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তারা এ-দিয়ে গুলি ছুঁড়তে জানে কি না। তারা ত হেসেই অস্থির। স্টেনগান ইত্যাদি যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারই তাদের শিখতে হয়েছিল—রিভলভার ত তাদের কাছে অতি সামান্য জিনিস। তাদের লক্ষ্য কেমন অব্যর্থ ছিল গর্বের সঙ্গে সেকথা তারা আমায় বললে। তারা নানা ভাষায় কথা কইতে পারে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়েছিল। তাদের দাদা ও দিদিরা অনেকে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রাণী ঝান্সি বাহিনীতে যোগদান করেছিল এজন্যে তারা রীতিমত গৌরব বোধ করে। তারা আপশোষ করে বললে যে, তারা যদি তাদের দাদাদের ও দিদিদের মত বড় হতো তা হলে তারাও দেশের স্বাধীনতার জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতে পারত।

এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত কোয়ালাপিলা—এর কয়েক মাইল দূরে একটি অখ্যাত শহরে এ রাজ্যের রাজা বাস করেন। শহরটিতে দেখবার মতন কোন জিনিসই নেই।

সেলাঙ্গর

এটিও মালয়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩,১৫০ বর্গমাইল হবে। এ রাজ্যের সুলতান ক্লাঙ্ নামে একটি ছোট শহরে বাস করেন। এখানে কারুকার্য-খচিত মসজিদটি একটি দেখবার

জিনিস। সুলতানের প্রাসাদ ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর বিদ্যমান। এখান থেকে মাইলচারেক দূরে পোর্ট সোয়েটান্‌হ্যাম বন্দর। এদিকে মরিব বিচ্‌ নামে সাগরের ধারের জায়গাটিতে নারিকেলবৃক্ষ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়—বৃক্ষশ্রেণী মাইলের পর মাইল প্রসারিত। এই বন্দরে ভারতগামী জাহাজ যাতায়াত করে থাকে। সেলাঙ্গরের মধ্যে কোয়ালা-লামপুর একটি বড় শহর। এখানে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস আছে। এখানকার বৃটিশ রেসিডেণ্টের পাহাড়ের ওপরকার ভবন ও তার পার্শ্বস্থ হ্রদ-সংলগ্ন উদ্যানটির দৃশ্য পরম রমণীয়। কিন্তু জাপানী আমলে জাপ গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানের অভাবে এটি এখন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। এখানে একটি যাদুঘর ছিল—মার্কিন বোমা-বর্ষণে এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোয়ালা-লামপুর স্টেশনটি খুব বড় ও দেখতে বেশ সুন্দর। পাশেই বড় বড় হোটেল ও গভর্নমেণ্ট অফিস। এখানকার বেশিরভাগ বড় বড় বাড়ির মালিক হচ্ছে চীনারাই। তবে মাদ্রাজী চেট্টিয়া-সম্প্রদায়ের অনেকে ব্যবসায়াদির দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করে স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে লক্ষপতিও বিরল নয়, তাদের প্রাসাদোপম বিরাট ভবনসমূহ তাদের আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।

ইপো রোডের দিকে গেলে আই. এন. এ. ক্যাম্প দেখতে পাওয়া যায়। এখন সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যেরা সব রয়েছে। ফটকের সামনে কতকগুলো বৃটিশ ও ভারতীয় সৈনিক সঙীন উঁচু করে পাহারা দিচ্ছে। দেখে মনে হলো তারা বেশ ফুর্তিতেই আছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের যতই উৎপীড়ন করুক না কেন তারা সকল দুঃখকষ্ট হাসিমুখেই সহ্য করতে বদ্ধপরিকর। এদিকে চুনা পাহাড়ের গুহাটি বাতুকেভ নামে পরিচিত। এটি একটি দেখবার জিনিস।

পাহাং

পাহাং স্টেটটি মালয়ের পূর্বদিকে। এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৪,০০০ বর্গমাইল। এ রাজ্যের আয়তন বিরাট হলেও শুধু পাহাড় আর জঙ্গলে ভর্তি বলে এখানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিশেষ উন্নতি হতে পারেনি—ধান ও রবার এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাঠ এখানে প্রচুর। এর মধ্যে ক্যামেরান হাইলাণ্ড, ফ্রেসার হিল, কোয়ালা লিপিস, রব, পেকান বিখ্যাত জায়গা।

পেরাক

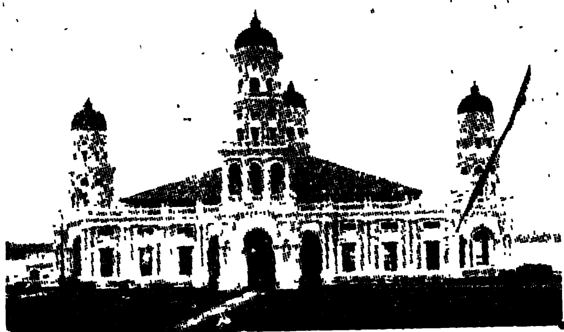
এই স্টেটটি মালয়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৭,৮০০ বর্গমাইল। এর রাজধানী কোয়ালা-কাংসর। পেরাকনদীর ধারে সুলতানের মসজিদ ও প্রাসাদ নবাগত পথিকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এর মধ্যে ইপো শহরটি দেখতে খুব চমৎকার। এখানে একটি বিমানঘাঁটি আছে। এ-রাজ্যে চীনাদের সংখ্যাই বেশি। টাইপিং একটি স্বাস্থ্যনিবাস। এই রাজ্যটি টিন ও রবারের জন্য বিখ্যাত। চীনারা ও ইংরেজরা এখানকার টিনের খনির মালিক। এখানকার কোনো কোনো গিরিশিখরের উচ্চতা প্রায় ৮,০০০ ফুট।

আনফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়

আনফেডারেটেড্ স্টেটস্ অফ মালয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ—জোহর, কেদা, পার্লিস, ট্রেঙ্গানু ও কেলানটন। প্রত্যেক স্টেটে একজন করে সুলতান আছেন। তাঁরা বৃটিশ এডভাইসরের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যশাসন করেন। এস্টেটগুলির বিচারকার্যাদি সুলতান আর তাঁর মন্ত্রীবর্গই সম্পন্ন করেন।

জোহর

এটি মালয়ের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯,০০০ হাজার বর্গমাইল। এর তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। পাহাড় এদিকে আছে বটে, তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় খুব কম। জোহরবারু এ রাজ্যের রাজধানী। মালাক্কা প্রণালীর ধারেই অবস্থিত এই নগরীটির দৃশ্য পরম রমণীয়। পাশেই ছোট্ট পাহাড়ের উপর সুলতানের প্রাসাদ। এখানকার সুলতান অন্য সব স্টেটের সুলতানদের চেয়ে



জোহরের সুলতানের প্রাসাদ

বিত্তশালী ও প্রতাপান্বিত। দূরে ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ ও নারিকেলশ্রেণী-শোভিত সিঙ্গাপুর নজরে পড়ে। একটি সেতু জোহরের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের যোগস্থাপন করেছে। এর ওপর দিয়ে রেলগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে। এই স্টেটের প্রধান খনিজ দ্রব্য হচ্ছে লোহা ও টিন। রবার, ধান, আনারস প্রভৃতি হচ্ছে এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

কেদা

এ স্টেটটি পেরাকরাজ্যের উত্তরে ও মালয়দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রথমে এটি ছিল শ্যামদেশের অন্তর্ভুক্ত। পরে কোন কারণে শ্যামরাজ্যের রাজা ইংরাজদের এ রাজ্যটি ১৯০৯ সালে দিয়ে দেন। এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩,৬৪৮ বর্গমাইল। এটি পাহাড়পর্বতে সমাচ্ছন্ন। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুনং জেরাই—উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। এ স্টেটটির রাজধানী আলোর স্টার। এ অঞ্চলটিতে অন্যান্য যাবতীয় অঞ্চলের চেয়ে ধান বেশি হয়। রাজ্যটির সর্বত্রই মাইলের পর মাইল জুড়ে চলেছে ধানের ক্ষেত—এখানকার মুক্ত আকাশের নিচে দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেতের সবুজ সমারোহ শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুদূর প্রবাসে বাঙালীর মনকে গৃহের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এখান থেকে মালয়ের নানা জায়গায় ধান চালান যায়। রবারক্ষেতের বন এখানে অন্যান্য জায়গার তুলনায় খুবই কম। এখান থেকে মালাক্কা প্রণালী খুবই কাছে। প্রণালীর ধারে নারিকেল গাছগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নীল সাগরের পটভূমিকায় শ্যাম নারিকেলবনের অপূর্ব সৌন্দর্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। এখান থেকে দক্ষিণে সিঙ্গাপুর যাওয়া যায়—আর উত্তরে পার্লিস রাজ্যের মধ্য দিয়ে রেলে করে শ্যামের রাজধানী বাঙ্ককে যাওয়া যায়। এ-রাজ্যে সুঙ্গিপাটানি নামে আরও একটি সুন্দর ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ শহর আছে।

পার্লিস

এটি সবচেয়ে ছোট স্টেট—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩১৬ বর্গমাইল মাত্র। এ-স্টেটের সুলতান পার্লিসেই থাকেন। এটি পূর্বে কেদা স্টেটের মধ্যে

ছিল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আলাদা হয়ে যায়। পার্লিসের সুলতানই এখন গোটা স্টেটের মালিক। এখানে চুপিং নামে একটি জায়গায় চুনা-পাথরের একটি মাঝারিরকমের গুহা আছে। ধান এখানে প্রচুর পরিমাণে হয়, তবে রবারের আবাদও যথেষ্ট আছে।

ট্রেঙ্গান্থ

এটি দক্ষিণ চীন সাগরের ধারে কেলানটন ও পাহাঙের মধ্যে অবস্থিত। এস্টেটটি জঙ্গলাকীর্ণ ও পর্বতবেষ্টিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫,০০০ হাজার বর্গমাইল। এ জায়গাটিও পাহাঙের মত অনুর্বর। লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ এখানে পাওয়া যায়। রবার ও ধানের ক্ষেত খুব অল্প। এখানে একজন সুলতান থাকেন। কোয়ালা-ট্রেঙ্গান্থ চীন সাগরের ধারে একটি বড় শহর। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও গাছের ওপর ঘর বানিয়ে বাস করে—এ সমস্ত ঘর আসামের গারোদের বোরাংএর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিকে চীনা ও ভারতীয় খুব কম। এ অঞ্চলের সর্বত্রই মালয়ীদের বিপুল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামগুলোর অধিকাংশই মালয়ীগ্রাম। মাছের কারবার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

কেলানটন

এ স্টেটটিও পাহাং ও টেঙ্গান্থর মত পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। এখানেও কৃষির উন্নতি বড় একটা হয়নি। এ অঞ্চলটিতেও আদিমবাসীদের বাস আছে। এটিও দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫,৭১৩ হাজার বর্গমাইল। কোটাবারু চীন সমুদ্রের ধারে সুন্দর শহর। তবে বর্ষাকালে শহরটি প্রায় জলমগ্নই থাকে। দক্ষিণ

শ্যামের হাজাই শহর থেকে শ্যাম স্টেট-রেলওয়ের রেলপথ কোটাবারু ও কোয়ালা লিপিস দিয়ে মালয়ের পশ্চিমভাগের রেললাইনের সঙ্গে গিমাস নামক একটি স্টেশনে গিয়ে মিশেছে। এ জায়গাটি মাছের কারবারের জন্য বিখ্যাত। সুলতানই এ স্টেটের রাজা ও হর্তাকর্তা বিধাতা। এইখান থেকেই (কোটাবারু) জাপানীরা প্রথমে মালয়দেশ আক্রমণ করে।

ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট অফ মালয়

সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ও প্রভিন্স ওয়েলেসলি এই কয়টি অঞ্চল নিয়ে স্ট্রেট সেটেলমেণ্ট অফ মালয় গঠিত। পেনাং শহরটি প্রভিন্স ওয়েলেসলির মধ্যে পড়ে। এগুলি বৃটিশের খাসরাজ্য। প্রত্যেক স্টেটের মধ্যে একজন করে কাউন্সিলর আছেন। কেবল সিঙ্গাপুর শাসিত হয় একজন গভর্নরের দ্বারা—অন্যান্য অঞ্চলের কাউন্সিলারগণ তাঁর অধীন। গভর্নরকে আবার বিলাতের কলোনিয়াল অফিসের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এই নিয়ম প্রবর্তিত হয় ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে। এর আগে মালয় এসিয়ার অংশ বলে এটি ভারত গভর্নমেণ্টের শাসনাধীন ছিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত অঞ্চলে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী দ্রব্যাদির উপর কোনো শুল্ক ধার্য করে না। শহরগুলি ব্যাবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মালয়ের এই অংশে চীনারা সংখ্যায় বেশি ও তারা সমস্ত ব্যবসা একচেটে করে রেখেছে। এ দেশের সম্পদ ভোগ করছে চীনারা আর মালয়ীরা তাদের গোলামি করে কোনো মতে প্রাণ ধারণ করছে—ব্যবসা-বাণিজ্যে এখনো এদের হাতেখড়ি হয়নি বললেই চলে।

সিঙ্গাপুর

এটি একটি ছোট্ট দ্বীপ—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২০৬ বর্গ মাইল। আশপাশের দ্বীপ নিয়ে ২২৩ বর্গমাইল হবে। একটি সেতু জোহরের সঙ্গে এই স্থানের যোগস্থাপন করেছে। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী স্যার স্টামফোর্ড র‍্যাফেল ইস্ট ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে জোহরের সুলতানের কাছ থেকে এটি ইজারা নেন। পরে ২রা আগস্ট ১৮২৪ খৃস্টাব্দে সমস্ত দ্বীপটা ক্রয় করেন।

জোহরের সেতু থেকে অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ষোল মাইল গেলে তবে সাগরের ধারে বড় বড় নয়নমুগ্ধকর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা; স্যার র‍্যাফেল নামাঙ্কিত র‍্যাফেল কলেজ; হাসপাতাল, স্কুল, ষোল তলা উচ্চ ক্যাথে প্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি বড় বন্দর ও একটি বিমানঘাঁটি আছে। এখানকার চীনাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। এখানকার চীনা ও বৌদ্ধমন্দির দেখবার জিনিস। হিন্দুদের অনেক সুন্দব সুন্দর মন্দিরও এখানে আছে।

মালাক্কা

এই শহরটি মালযের সবচেয়ে পুরানো শহর। এখানেই প্রথমে বাণিজ্যের জন্য বিদেশীরা বড় বড নৌকা করে আসতো, কিন্তু সিঙ্গাপুর আর পেনাং বন্দর স্থাপিত হওয়ার পর মালাক্কার পূর্বগৌরব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং এর গুরুত্বও কমে গেছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম এ শহরটি দখল করে এখানে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে। এখনও পাহাড়ের ওপর তাদের গীর্জার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ১৬৪১ খৃস্টাব্দে ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেয়। তারপরে বৃটিশ আর ওলন্দাজ এই দুইটি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারস্পারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কতকগুলি শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তারই আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা এটি ইংরেজদের নিকট হস্তান্তরিত করে। এখানে অনেক পুরানো



রোমান ক্যাথলিক চার্চ

অট্টালিকা দেখতে পাওয়া যায়। শহরটি বিশেষ পরিষ্কার নয়—বাজারের শুটকি মাছের মধুর গন্ধ বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শহরটির মধ্যে দিয়ে মালাক্কা নদী বয়ে যাচ্ছে। এখানেও চীনাদের সংখ্যাই

বেশি। তারাই শহরে ধনী বলে পরিচিত—বড় বড় দোকানের মালিক। মালয়ীরা গরীব—গ্রামেই তারা বাস করে। এখানকার হাসপাতালটির অত্যুচ্চ ভবনটিও বিশেষভাবে পথিকের চোখে পড়ে।

পেনাং

চারিদিকে সাগরের নীল বারিরাশির অনন্ত বিস্তারের মাঝখানে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ পেনাং দ্বীপটি দেখতে ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিটির মত সুন্দর। এটি প্রভিন্স ওয়েলেসলির মধ্যে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৭ বর্গমাইল। বাটারওয়ার্থ থেকে ফেরি জাহাজে করে পেনাং যেতে হয়। বৃটিশেরা যখন প্রথম ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে এদেশে আসে তখন সব কয়টি ভাল ভাল বন্দর ছিল ওলন্দাজদের আর না হয় পর্তুগীজদের দখলে। নিজেদের বন্দরের অভাবে এরা গোড়ার দিকে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না; তখন ভারত গভর্নমেণ্ট পেনাং দ্বীপে এদের ব্যবসা বাণিজ্য করবার বন্দোবস্ত করে দিতে উদ্যোগী হলেন। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্ লাইটের মধ্যস্থতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেদার সুলতানের কাছ থেকে দ্বীপটি কিনে নিলেন। বৃটিশের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক ১৭৮৬ খৃস্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে পেনাং দ্বীপে উড্ডীন হলো। সেইদিনই সম্রাট চতুর্থ জর্জের জন্মদিন। তাঁর নাম অনুসারে পেনাং দ্বীপের নূতন নামকরণ করা হলো প্রিন্স অফ ওয়েলস্ দ্বীপ, আর শহরটির নাম হলো জর্জ টাউন। পেনাং মালয়ী ভাষার শব্দ, মানে সুপারী। এই নাম থেকে বোঝা যায় যে একসময়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে সুপারী ফলতো। পেনাং পাহাড়ের ঊর্ধ্বগামী রেলপথ, চীনাদের বৌদ্ধ মন্দির আয়ার ইটাম ও সর্পমন্দির প্রভৃতি অনেক

কিছুই দেখবার জিনিস এখানে আছে। এখানেও চীনারাই সবচেয়ে ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। এককথায় বলতে গেলে মালয় দেশটাকে চীনারা কামধেনুর মত দোহন করে নিচ্ছে—আর মালয়ীরা তাদের প্রসাদের কণামাত্র পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে—মালয়ীরা বাস্তবিকই সবদিক দিয়েই পরবাসী।

মালয়ের আদিবাসীদের কথা

সেমাং

সুদূর অতীতে মালয়দেশটা আগাগোড়াই ছিল পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। তখন সেমাং নামক একটি অরণ্যচারী আদিম জাতি এখানে বাস করতো। এরা দেখতে ছিল ঠিক কাফ্রিদের মত। এদের গায়ের রং ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুলগুলো ছিল মেষলোমের মত কোঁকড়ানো আর এদের ঠোঁটগুলো ছিল পুরু পুরু। কেউ কেউ বলে, এরা নাকি ভারত আর পারস্য থেকে এসেছিল। সম্ভবতঃ আফ্রিকা দেশ থেকে এদেশে এসে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। এরা চাষবাস করতে জানতো না, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তীর ধনুক দিয়ে পাখী, সাপ আর বন্যজন্তু শিকার করে এদের দিন কাটতো। এই সমস্ত প্রাণীর মাংস আর বুনো ফলমূল খেয়ে এরা জীবন ধারণ করতো। এক জায়গায় দু'তিন দিনের বেশি থাকার অভ্যাস এদের ছিল না। এই যাযাবর জাতির লোকেরা ঘর বাড়ি তৈরী করতে জানতো না, গাছতলায় অথবা গিরিগুহায় পাতা জ্বেলে শুয়ে এদের রাত কাটতো। ভোর হতেই সপরিবারে আহারের অন্বেষণে নূতন জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তো। এরা গাছের বাকল পরে লজ্জা নিবারণ করতো। উপদেবতার অস্তিত্বে এরা বিশ্বাস করতো। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর এক একজন অধিষ্ঠাত্রী উপদেবতা আছেন বলে এদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ আর বজ্রকে এরা অত্যন্ত ভয় করতো। এদের ধারণা ছিল, মরে গেলে মানুষ স্বর্গে

যায়—স্বর্গটা আসলে ফলেভরা ছোট্ট একটা দ্বীপ। সেখানে মৃতেরা মনের সাথে ফল ভক্ষণ করে। এর বেশি এরা ভাবতেও পারতো না। এই আদিম জাতির বংশধরদের মালয় দেশের পূর্বদিকের জঙ্গলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

সাকাই

এদের আগমনের পরে উত্তরদিক থেকে আরেকদল আদিবাসী এদেশে এসেছিল তাদের বলা হত সাকাই। তারা ছিল সেমাং জাতির লোকদের চেয়ে ঢের লম্বা, তাদের গায়ের রং ছিল তামাটে আর তাদের মাথায় ছিল রেশমের মত মসৃণ কালো কালো কোঁকড়ানো চুল। তারা সেমাং জাতির লোকদের মত নোংরা ছিল না—তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতো। তাদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, তারা চাষবাস করতে জানতো। তারা বন জঙ্গল কেটে ধান, ইক্ষু আর ট্যাপিওকার আবাদ করতো। ট্যাপিওকা মালয়ের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে ফলে। এগুলি গোলআলু জাতীয় একপ্রকার মূল। তবে ভাতের অভাবে এইগুলো দিয়ে পেট ভরানো যেতে পারে।

সাকাই জাতি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতো—নিজেদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তারা মোটেই পছন্দ করতো না। এরা সবসময়ে একজন দলপতির অধীনে থাকতো এবং তার নির্দেশ মেনে চলতো। পশুপক্ষী শিকারের রেওয়াজ এদের মধ্যেও ছিল। এরা বাড়ি তৈরী করতে জানতো—আতপপাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তারা বাস করতো, তারা বাঁশের চোঙাতে ফুঁ দিয়ে তীর ছুড়তো, আর সেই তীরের মুখে লাগানো থাকতো ইপো নামক বিষাক্ত বৃক্ষের নির্যাস। তাদের বিষাক্ত তীর কোনো বন্যজন্তুর গাত্রস্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই

সেটি মারা যেতো। ভূতপ্রেতদের ভয়ে এরা সর্বদাই শঙ্কিত থাকতো এবং তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা পুরানো মৌচাক কিংবা নারিকেলের খোলা বাড়ির আশেপাশে ঝুলিয়ে রাখতো। তাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায় অবলম্বন করলে ভূতপ্রেতাদি ঘরে ঢুকে অকল্যাণ করতে পারে না। কেউ মারা গেলে তারা তার মৃতদেহকে গোর দিতো ও মৃতব্যক্তির কবরের উপর খাদ্য আর অস্ত্রশস্ত্র রেখে আসতো। মৃতব্যক্তির আত্মাকে গ্রামছাড়া করবার জন্যেই নাকি তাদের সমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এটি ছিল এই আদিমবাসীদের ভূত ভাগানোর প্রক্রিয়া।

সাকাইরাও এক জায়গায় খুব বেশি দিন থাকতো না। তার কারণ ছিল জমিতে বারংবার ফসল উৎপাদনের পর যখন আর বেশি ফসল সেখানে উৎপাদন হতো না তখন তাদের একরকম বাধ্য হয়েই সেস্থান পরিত্যাগ করে অন্যজায়গায় জঙ্গল কেটে বাস করতে হতো। সেমাংদের ন্যায় মালয়ের বনজঙ্গলে সাকাইদেরও বংশধরদের এখনও দেখা যায়। তারা এখনও সেই আদিম অবস্থায় আছে।

যাকুন

এ ছাড়া যাকুন বলে আর একটা আদিম জাতি সুদূর অতীতে মালয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা মালয়ের দক্ষিণ দিকে সাগরের ধারে বাসা বেঁধে থাকতো। এদের বিষয় বেশি কিছু তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। শুনেছি যে, সমুদ্রে ছিল এদের অখণ্ড প্রতাপ। সেকালে এরা জল-দস্যু নামে অভিহিত হতো। এদের গায়ের রং ছিল কালো, আর চুলগুলো ছিল সোজা। মালয়ে এদের বংশ এখনো বিদ্যমান।

মালয়ী

সেমাং, সাকাই ও যাকুন জাতির এদেশে আসবার কয়েক শতাব্দী পরে একদল লোক দক্ষিণ চীনের ইউনান পর্বতের উত্তর অঞ্চল থেকে এদেশে এসে পৌছল। এদের মাথার খুলি উপরোক্ত আদিবাসীর তুলনায় বেশ বড়। এরা খুব বুদ্ধিমান। এদের নাকের মাঝখান চ্যাপ্টা; মাথায় কালো কালো খাড়া খাড়া চুল আর চোখগুলো খুব ছোট ছোট। এরা হচ্ছে মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত আদিম জাতিবিশেষ। এরাই হচ্ছে মালয়ের অধিবাসী মালয়ী জাতি। পাহাড়ে চাষবাস দ্বারা বেশি ফসল উৎপাদন করতে না পারায় এদের খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় সে জন্য এরা নিজেদের আদিবাসস্থান ছেড়ে এদেশে এসে হাজির হয়। এখানে এসে এরা বন জঙ্গল কেটে সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে লাগলো। সাকাই, সেমাং আর যাকুনরা আদিম কুসংস্কারসমূহ আঁকড়ে ধরে জঙ্গলেই পড়ে রইল আর ওদিকে মালয়ীরা ক্রমে ক্রমে সভ্য হয়ে উঠতে লাগলো। এখন মালয়ে যেসব মালয়ী দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান্, অনেকে আবার ব্যবসাবাণিজ্যেও বিশেষ উন্নতি করেছেন ও অন্যান্য অভিজাত সমাজে এরা যোগ্য মর্যাদা লাভ করেন। সাকাই, সেমাং প্রভৃতি আদিবাসীদের এবং বিশেষভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মালয়ীদের বৈবাহিক সম্পর্কের আদানপ্রদান হওয়ায় এদের সমাজদেহে এখন বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। খাঁটি মালয়ী রক্ত এখন মালয় দেশে বিরল।

মালয়ের ধর্ম ও ভাষা

মালয়ে চীনারা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি, আর সেমাং ও সাকাইদের

লোকসংখ্যা হচ্ছে সকলের চেয়ে কম। বিভিন্ন জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত বলে এখানে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত। এখানকার চীনাদের ধর্মানুষ্ঠানেই সকলের চেয়ে বেশী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, কাজেই তাদের ধর্মের কথাই প্রথমে বলছি।

এদের তিনটি ধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম ও তাও ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম অতীতে কিভাবে চীনে প্রচারিত হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই। কনফুসিয়ান ধর্মের প্রবর্তক কুং ফু জু। ইনি ৫৫১ খৃষ্টপূর্বাব্দে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাও ধর্মের প্রবর্তক লাও জু। এই তিনটি ধর্মের মধ্যে গভীর যোগ রয়ে গেছে। এগুলির সার কথা এক, অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই এখানে সবচেয়ে বেশী। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও এখানকার চীনারা এমন অনেক দেবদেবীর পূজা করে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যাঁদের কোনো সম্বন্ধ নেই। সম্ভবতঃ এগুলি তাদের আদিম দেবদেবী। এঁদের মধ্যে দেবী কুয়ান ইয়ানের (দয়ার দেবী) ওপর চীনাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। ইনি নাকি দক্ষিণ চীনসমুদ্রের বিপদ থেকে চীনা নাবিকদের সতত রক্ষা করেন। নাবিকরা এঁকেই সকলের চেয়ে বড় দেবী বলে মান্য করে। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী আর একটি দেবীর নাম মা-চো-পো। এই দেবীর পূজা বিশেষভাবে ফুকিয়ান প্রদেশের লোকেদের মধ্যেই প্রচলিত। এইসব দেবদেবীর মূর্তি পেনাং-এর আয়ার হিটাম মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুরে মন্দিরের সংখ্যা নেহাত কম। তবে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: তেলক আয়ার স্ট্রীটে হক্কিয়ানদের তিয়ান হক্ কিয়ান ও ক্যান্টনিজদের ফুক, টাক, সী মন্দির; ফিলিপ স্ট্রীটে লৌ, ইয়াং, কেং, কিম্‌কিট রোডে সীয়ন, লীম, সী আর রেসকোর্স রোডে হ,

পায় মন্দির দেখবার জিনিষ। মালাক্কায় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত পুরানো মন্দির চেং, হন, তেং এখনও বিদ্যমান। পেনাঙের আয়ার ইটাম আর সর্প-মন্দিরে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে।

চীনাদের উৎসব

চীনারা বৎসরে ছয়টি করে উৎসবের অনুষ্ঠান করে। তন্মধ্যে তিনটী জীবিতদের ও তিনটি মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়। জীবিত আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলকামনায় যে তিনটি উৎসব প্রতিপালন করা হয় তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নববর্ষোৎসব—জানুয়ারীর শেষাশেষি কিংবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে আমোদ-প্রমোদের ধুম পড়ে যায় আর উৎসবগৃহে সমাগত লোকজনকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। এর মাসচারেক পরে দ্বিতীয়টির আয়োজন হয়। একে বলে ড্রাগন-উৎসব। ড্রাগনকে চীনারা দেবতার মতই ভক্তি করে। মালয়ে সমস্ত চীনা মন্দিরে ড্রাগনের প্রতিমূর্তি আছে। এই উৎসবেও আমোদ-প্রমোদ খাওয়ান-দাওয়ান পুরোদমেই চলে। এর মাসতিনেক পরে সুরু হয় শস্যকর্তনোৎসব। ধানকাটা হয়ে গেলে এরা উৎসবানন্দে মেতে ওঠে। এই উপলক্ষে বিপুল ভোজের আয়োজন হয়। এ উৎসবটি অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের নবান্ন উৎসবের মত। এ-সময় এদের মধ্যে পিঠা তৈরী করার রেওয়াজ আছে—সেগুলোর আকার আমাদের চন্দ্রপুলি পিঠার মত তবে কিছু বৃহৎ। এই সময়ে এরা কাগজের লণ্ঠন বানিয়ে বাড়ীর চারিদিক সাজায়।

মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সদগতি-কামনায় যে তিনটি উৎসব হয় তন্মধ্যে প্রথমটি এদের তৃতীয় মাসে পড়ে। এই সময় মৃতের কবর

পরিষ্কৃত ও মেরামত করা হয়। প্রথম মাসে যে উৎসব হয় তার প্রধান অঙ্গ হল নিজ নিজ আত্মীয়দের লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ-কামনায় সমবেতভাবে এরা প্রার্থনা করে। এই সময় এরা মৃতব্যক্তিদের কবরের ওপর হরেকরকমের খাদ্যদ্রব্য, কাগজের তৈরী একরকম নকল টাকা, বস্ত্রাদি ও আবাসপত্র রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই জ্বলন্ত বস্তুপুঞ্জ থেকে প্রচুর ধূম উর্ধ্বপানে উত্থিত হয়। এদের বিশ্বাস যে, এই ধোঁয়ার কুণ্ডলী পরলোকে গিয়ে পৌছায় এবং মৃতব্যক্তিদের স্বর্গবাসী আত্মারা এই ধূমরাশি দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। তৃতীয় উৎসবটি প্রথমটার পুনরাবৃত্তি—নয় মাস পরে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে, বস্ত্র-প্রজ্বালন পর্ব। ঘরে ঘরে ঐ সময় নূতন কাপড় জ্বালানো হয়। এরা মনে করে যে এই সমস্ত দগ্ধ বস্ত্র আবার নূতন হয়ে পরলোকে যায় এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়েরা সেগুলো পরিধান করে। চাঁদের গতি অনুসারে এদের মাস-গণনার পদ্ধতি। এদের মাস হচ্ছে চান্দ্রমাস। আর প্রত্যেকটি বছরের নামকরণ হয় জীবজন্তু বা প্রাণী-বিশেষের নাম অনুযায়ী। চীনাদের বর্তমান বৎসরের নাম হচ্ছে খাও (কুকুর) লি (সাল) ১৮৮৬ এবং আগামী (১৯৪৯) বৎসরের নাম হবে তু (মোরগ) লি ১৮৮৭।

মালয়ে হিন্দু সভ্যতা ও মালয়ীদের ধর্ম

মালয়ীরা প্রথমে নিজেদের আদিম ধর্ম অনুসরণ করে চলতো। কালক্রমে হিন্দুধর্মের প্রভাব এখানে বিস্তৃত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের রাজাদের আনুকূল্যে হিন্দুধর্ম-প্রচারকগণ এদেশে ও আশেপাশের দেশগুলিতে এসে ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষেও এখানে বহু ভারতীয়ের আগমন হতে থাকে।

এমনিভাবে সারা মালয় আর চতুষ্পার্শ্বস্থ সুমাত্রা, ইন্দোচীন, জাভা ও বলী প্রভৃতি দেশগুলোতে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুসভ্যতার প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। মালয়ের মধ্যে কেদা, প্রভিন্স ওয়েলেসলি ও পেরাক রাজ্যগুলির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যেত—এ-সময়টি হল খৃষ্ট-জন্মের চারশো বৎসর পরে। তাঁরা প্রায়ই কেদারই পুরাতন অধিবাসী ছিলেন ও তাঁদের স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ সুঙ্গিপাটানির সুঙ্গি বাটু এষ্টেটে, প্রভিন্স ওয়েলেসলি, পেনাং এবং পেরাক রাজ্যের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। এইসব দক্ষিণ-ভারতীয়দের নেতা ছিলেন বুদ্ধগুপ্ত। তিনি জাহাজের মালিক ছিলেন এবং পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধমন্দির করে দেন। সপ্তম শতাব্দীতেও বর্মা, চীন ও মালয় দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে তাঁরা এখানে অনেক বন্দর তৈরী করেছিলেন। বন্দরে জাহাজ নোঙর করে ব্যবসা-বাণিজ্য তো করতেনই, পরন্তু এখানে যে অনেকদিন পর্যন্ত বসবাস করতেন এখনও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ মন্দিরের দ্বারা তার আভাস পাওয়া যায়। তামিলদের মালয়ীরা ডাকতেন ওরাং ক্লিং। এইরকম করে হিন্দুধর্ম-প্রচারক ছাড়াও তাঁরা মালয়ীদের মধ্যে এসে হিন্দুধর্ম বিস্তার করবার সুযোগ পান। তাঁদের নামের সঙ্গে শ্রীবিজয়বংশ ও কলিঙ্গ রাজপুত্রেরা (যাঁরা জাভাতে প্রথম গিয়ে হিন্দুসভ্যতা বিস্তার ও শকাব্দ প্রচলিত করেন) উল্লেখযোগ্য।

পরে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের স্রোত এখানে মন্দীভূত হয়ে পড়ে। তখন আরবদেশ থেকে একদল ইসলামধর্ম প্রচারক এদেশে আসেন। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে মালয়ের শেষ ব্রাহ্মণ বলীদ্বীপে চলে যান। বলীদ্বীপ-বাসীদের দৈনন্দিন জীবনে ও আচার-অনুষ্ঠানে এখনও হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতিক প্রভাব বিদ্যমান।

মালয়ে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে ইসলামধর্ম প্রচারকগণ প্রথমে

রাজাদের মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করেন। রাজারা মুসলমানধর্ম নিয়ে মুসলমান নাম গ্রহণ করলেন আর প্রজাদেরও বলপ্রয়োগপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে লাগলেন। যদি কেউ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত হতো তাহলে তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। এছাড়া আরো নানারকম অত্যাচার উৎপীড়ন করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হতো। ইসলামধর্ম প্রচারের ইতিহাস সর্বত্রই এক। যাই হক এমনিভাবে জবরদস্তিমূলক পন্থা অবলম্বনের দরুন অচিরেই সমগ্র মালয়ে ইসলামের অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হলো। এখন মালয়ীরা মুসলমান, তাঁরা আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের মতই যাবতীয় মুসলমানী উৎসব প্রতিপালন করেন। মালয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোকই আছে। সেমাং ও সাকাই প্রভৃতি অধিবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ আজকাল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে।

মালয়ীদের ভাষা

চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এদের মধ্যে লেখাপড়ার আদৌ প্রচলন ছিল না ও এদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। যখন আরব থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ এদেশে আগমন করেন তখন তাদের কাছ থেকে এরা আরবী ভাষায় লেখাপড়া শুরু করে। এখন এদের মধ্যে আরবী ও রোমান অক্ষর এ দুয়েরই প্রচলন আছে। যখন এখানে হিন্দুধর্মের একাধিপত্য ছিল তখন অনেক সংস্কৃত শব্দ মালয়ী ভাষায় ঢুকেছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে তামিল ভাষার বহু শব্দ মালয়ী ভাষায় স্থান পেয়েছে। মালয়ী ভাষায় তামিলের ন্যায় জাহাজকে কাপাল, নৌকাকে প্রাহু, দোকানকে কেদাই বলা হয়। এদের নিজস্ব ভাষায় আরবী

শব্দেরও ছড়াছড়ি। মালয়ী ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই। শব্দগুলো একত্র করে মানে বুঝিয়ে দিলেই হলো।

মালয়ীরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। এদের মধ্যে বহু প্রবচন প্রচলিত আছে। তা থেকে এদের জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলোর ভাবার্থ দেওয়া যাচ্ছে।

এরা সব সময়ে অপ্রয়োজনীয় বিপদের ঝুঁকি নিতে বা শক্তির অপচয় করতে ভালবাসে না।

১। "স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার সময় যদি তুমি লগি ঠেলে যাও, তাহলে কুমীরগুলো পর্যন্ত তোমায় দেখে হাসবে।"

২। "কাঁটায় ধার দেওয়ার আবার কি প্রয়োজন? সাগরের নীল জলে রং ফলাতে যায় কোন্ মূর্খ? বারিধারার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাহাড়গুলোর কোনো আশ্রয়স্থলের দরকার করে না।"

ধনীর সঙ্গে দীনদরিদ্র চাষী মজুরের বৈষম্য এখানেও আছে। এখানকার চাষীদের প্রাণের কথা হচ্ছে :—

৩। "ওরা হচ্ছে শৃঙ্গচঞ্চু পাখী, আমরা সামান্য চড়াই—তাদের দলে মিশে আমরা কেমন করে একসঙ্গে বেড়াই?" এদের প্রত্যেকটি প্রবচন উপদেশার্থক। মানুষকে ধৈর্যশীলতা, সাবধানতা প্রভৃতি গুণাবলীর শিক্ষা দেবার জন্যে এগুলো স্মরণাতীত কাল থেকে লোক মুখে চলে আসছে।

৪। "পথের শেষপ্রান্তে এসে যদি দিক্‌ভ্রান্ত হও, তাহলে সটান পেছনে ফিরে গিয়ে আবার নূতন করে যাত্রা শুরু করো।"

৫। "পথের নিশানা জানতে যদি তোমার সঙ্কোচ বোধহয়, তাহলে তুমি ঠিক পথ খুঁজে পাবে না। চারিদিকে যদি তোমার সজাগ দৃষ্টি না থাকে, তাহলে অপরে তোমার ওপর মুরুব্বিয়ানা ফলাবে।

আর যদি তুমি শিথিল প্রকৃতির হও, তাহলে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে যাবে।"

৬। "সময়মত অনুতাপ করলে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু অসময়ে অনুতাপ করে কি লাভ? একটি ছিপ আর একটিমাত্র টোপ নিয়ে যদি কেউ মাছ ধরতে যায় তাহলে মাত্র একবারের বিফলতায় তার গোটা দিনটাই মাটি হয়ে যেতে পারে।"

এরা অর্থ ও চেষ্টা অযথা নষ্ট করে না। এরা অল্প আয়াসে অধিক ফল লাভ হলে তার প্রশংসা করে।

৭। "সাপ মারবার সময় লাঠি যাতে না ভাঙে সেদিকে নজর রেখো। বর্শা দিয়ে মাছকে ঘায়েল করবার সময় বর্শাটা যাতে না ভাঙে সেদিকে খেয়াল থাকা চাই।"

তারা জানে।

৮। "কান যদি তোমার নরম হয়, তাহলে সবাই তা ধরে টানাটানি করবে।"

৯। "দুনিয়ায় কতকগুলো হাস্যকর ব্যাপার আছে। যেমন মাছি চায় ঈগল পাখীর সঙ্গে লড়াই করতে, মশক চায় সাগরবারি শুষে নিতে। চড়ুই পাখী যা গিলতে পারে তার চেয়ে ঢের বেশি শস্য এনে জড়ো করে। মোরগ ভাবে সে যদি না প্রভাতে ডাকে তাহলে সূর্য আর আকাশে উঠবে না।"

ফাঁকা সহানুভূতির চেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা কত বেশি তারা তা জানে।

১০। "যে চোখ শুধু (দুঃখের) বোঝার পানে তাকিয়েই থাকে সে দুঃখ ভোগ করে না। যে কাঁধ বোঝা বহন করে তার ভার কতটুকু শুধু সেই তা জানে।"

কিন্তু অত্যাচার যখন চরমে গিয়ে ওঠে তখন তারা অর্ধেকভাবে

বিদ্রোহী হতে ভালবাসে না—তারা পুরোপুরিভাবেই বিদ্রোহী হতে চায়।

১১। "একটি ভেড়া চুরির জন্যে যদি কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে একটি ভেড়ার বাচ্চা চুরির জন্যেও তার ফাঁসি হওয়া উচিত।"

১২। "নাইতে যদি হয় তাহলে সারা গা ভিজিয়ে স্নান করো। আচারের ভাঁড়ে হাতই যদি দিলে তো একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। কোন কিছুর পশ্চাদ্ধাবন যদি কর, তাহলে তাকে না ধরা পর্যন্ত থেমো না।"

তারা বুদ্ধিমান, তারা জানে প্রবীনের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া নিশ্চিত মৃত্যু।

১৩। "যদি আমি বিফল হই তাহলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো—আর যদি কৃতকার্য হই তাহলে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠবো।"

সে জন্য তারা চায়ঃ

১৪। "মরতেই যদি হয় তাহলে ছোট ছোট মাছের ঠোকরে টুকরো হয়ে মরার চাইতে সরাসরি বড় কুমীরের পেটে চলে গিয়ে পঞ্চত্ব লাভ করা অনেক শ্রেয়ঃ।"

১৫। "যদি তোমাকে কবরই দেওয়া হয় তাহলে সবচেয়ে দামী ও সুন্দর পোশাকের মধ্যে তোমার দেহ আচ্ছাদন করে তবে তুমি কবরে যেও।"

১৬। "সেই ব্যক্তি প্রশংসনীয় যে বাস করে বিড়ালের মত কিন্তু লম্ফ ঝম্ফ করে ব্যাঘ্রের মত।"

তারা খুব সরল কিন্তু

১৭। "চক্ষু সাদা হওয়ার চেয়ে অস্থি সাদা হওয়া শ্রেয়ঃ। অপমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃতুই বরণীয়।"

মালয়ীরা জ্ঞানকে পার্থিব সম্পদের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দেন। তাই তাঁরা বলেন :—

১৮। "ধনসম্পদ তো বারনারীর মত মানুষের সঙ্গে ছলনা করে, জ্ঞান কিন্তু কাউকে প্রতারিত করে না। যে পার্থিব সম্পদ পরলোকে তোমার সঙ্গে যাবে না, তার প্রতি লোভ কোরো না।"

নিজের ঘরের প্রতি এদের মায়া যে কত বেশি তার অভিব্যক্তি নিচেকার প্রবচনটিতে পাওয়া যায়—

১৯। "নিজের ঘরে মাচার ওপর যে শোয় সে তো রাজার মত সুখী। নিজের ঘরে যদি বিপদ বর্ষণ হয় সেও ভাল, তবুও অন্য ধনীর গৃহে সুখ বর্ষণ হলেও তা শ্রেয়ঃ নয়। নিজের গৃহের মত প্রিয় আর কিছুই নেই।"

২০। "অপরে তোমার প্রতি যে সমস্ত দয়াপ্রদর্শন করেছে সেগুলো কড়ায়-গণ্ডায় শোধ না হওয়া পর্যন্ত যাতে তুমি বেঁচে থাকতে পারো, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করো।"

এরা প্রেমকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছে নিম্নের কথাকটিতেই বুঝতে পারা যায়ঃ

২১। "ঘাসের মধ্যে আমি একটি মুক্তা হারিয়ে ফেলেছি। নিচে পড়ে থাকলেও এটির রং থাকবে বজায়। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি মুক্তাসদৃশ শিশির যেমন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় তার প্রেমও তেমনি একদিন চলে যাবে।"

২২। "তুমিই আমার প্রেম, আমার জীবন, আমার সর্বস্ব, তুমিই আমার আত্মা।"

২৩। "উড়ে যাওয়াই হচ্ছে ঘুঘুপাখীর নিয়তি। সে উড়ে যায় তার বাসায়। প্রকৃত প্রেমের তোরণ হচ্ছে চক্ষু। আর চোখের ভেতর দিয়ে আত্মার সন্ধানই হচ্ছে তার কাজ।"

তারা মুখের ভাষার তীব্রতা অনুভব করে—

২৪। "মিষ্টি ভাষাগুলো তীব্র হয়ে অস্থিগুলো টুকরো করে। মানুষের মুখ ধারালো অস্ত্র ও বর্শার চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ। সর্প ও গিরগিটির দ্বিজিহ্বা ও শাঁখের করাতের চেয়েও মানুষের একটি মাত্র জিহ্বা শক্তিশালী।"

আহত হয়ে যদি বিচারকের কাছে নালিশ জানায়, বিচারক তার উত্তরে বলেন—

২৫। "তোমরা অস্ত্রহীন, তোমাদের শক্তি নাই তাই শক্তিশালীর অন্যায়ের বিচার জানাতে তোমরা এসো না। অপমান বুকে সয়ে মুখ বুজে সেখান থেকে চলে যাবে।"

তারা তাই এই গানই গায়—

২৬। "যারা বড় তারা বড়দের সঙ্গেই থাকুক। আমরা গরীব শুধু একমাত্র ভাগ্যই আমাদের থাকুক।"

তারা প্রতিবেশীর দুঃখে আনন্দ করে না, তাই—

সূর্যমুখী ফুল যেটা অনেকদিন ফুটে নিচের দিকের শোভা বিতরণ করছিল—যদি সেটি খসে পড়ে যায় তাই বলে উপরে শোভিত নূতন প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী ফুল তাকে দেখে যেন না হাসে। এটাই হচ্ছে মানবের ধর্ম।

"প্রবাসী ভারতীয়ের চক্ষে মালয়"

মালয়ে মালয়ীরা

মালয়ের অধিবাসীদের বলা চলে প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এদের আচার-ব্যবহার সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি খুবই চিত্তাকর্ষক। মালয়ীদের সমাজে একজন করে 'পেংহুলু' বা মোড়ল থাকে। এই মোড়লের হুকুম সকলকে মেনে চলতে হয়, তবে শাস্তি দেবার প্রয়োজন হলে পুলিসই শাস্তি দেয়। মালয়ের বড় বড় শহরে মালয়ীদের ঠাঁই নেই—সেখানকার সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করে বিদেশীরা। মালয়ীরা প্রায়ই চাকরি কিংবা চাষবাস করে জীবিকানির্বাহ করে। আগেকার দিনে এদের মধ্যে মারাত্মক দাসত্ব-প্রথার চল ছিল। তবে এখন এই কুপ্রথা বিদ্যমান নেই। যদি কেউ টাকা ধার নিয়ে শোধ করতে না পারত, তবে এদের সামাজিক প্রথানুযায়ী সে-ব্যক্তিকে ছেলেমেয়ে-সুদ্ধ মহাজনের গৃহে চিরদিনের জন্য ক্রীতদাসরূপে থাকতে হতো। যদি কখনও এই সব ক্রীতদাস অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যেত, সেক্ষেত্রে তাদের মনিবেরা তাদের হত্যা করলে পর্যন্ত শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতো।

মালয়ী পল্লীর ঘরগুলো ভেতরে-বাইরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেওয়াল ও মেঝে কাঠের তৈরী। ঘরেরছাদ আতপপাতায় ছাওয়া। আসবাবপত্রের মধ্যে দু'একটি টুল, দু'একটি চেয়ার ইত্যাদি আছে। কোনো কোনো বাড়িতে একটা খাটিয়া পাতা, ঘরের দেওয়ালে নানা

রকমের ছবি দিয়ে সাজানো। মালয়ী মেয়েদের ঘোমটা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। মাথায় তাদের বাহারে খোঁপায় ফুলের মালা—কারও চুলে ফুল গোঁজা।



মালয়ী মেয়ে

মালয়ে ম্যালেরিয়া, (কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ খুব কদাচিৎ হয়) ব্যাধির প্রকোপ খুব বেশি। এদের মধ্যে ৬৫ থেকে ৭০জন

ম্যালেরিয়াতে ভোগে, পেটজোড়া পিলে অনেকেরই আছে। এখানকার গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক-ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় রোগটির সংক্রমণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মালয়ীরা অত্যন্ত গরীব। অর্থাভাবের দরুন অধিকাংশের পক্ষেই উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে রোগের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও এরা পারে না। খোঁজ করে দেখলাম এখানকার রোগীরা হাসপাতালে বড় একটা আসে না। রোগ হলে এরা তুকতাক আর টোটকা-ফোটকার উপরেই নির্ভর করে বেশি। সব গ্রামেই একজন করে ওঝা থাকে, ওঝাদের ওপর এদের গভীর আস্থা। মালয়ে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালের সংখ্যা ২৮৩টি, এর মধ্যে ৭২টি হচ্ছে বড় সাধারণ হাসপাতাল—অন্যগুলি ছোট ছোট। আর স্টেটের হাসপাতাল আছে ২৩২টি। মালয়ের হাসপাতালের এই সংখ্যাধিক্য দেখে যদি মনে করা যায় যে এগুলিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে, তাহলে ভুল করা হবে। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন ধনী ও দরিদ্র এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তারতম্য আছে মালয়েও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বাঙলাদেশের হাসপাতালে যেমন দেখতে পাওয়া যায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাব, মালয়েও তাই। এমন অনেক জটিল ব্যাধি আছে প্রথমে সাবধানতা অবলম্বন করলে যা সহজেই আরোগ্য হয়; কিন্তু গরীব রোগীরা পাড়াগাঁ কিংবা শহরের দরিদ্র পল্লী থেকে যদিবা কায়ক্লেশে ভাড়া জোগাড় করে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলো তো হাসপাতালে শয্যার অভাব এই অজুহাতে তাদের বিমুখ করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর বিফলমনোরথ হয়ে শেষে এরা অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওদিকে রোগ

ক্রমশই বেড়ে যায়, শেষে এমন এক সময় আসে যখন একান্ত নিরুপায় হয়ে রোগী শেষচেষ্টা করবার জন্যে হাসপাতালে এসে হাজির হয়। তখন ভর্তি করবার মালিক যাঁরা তাঁরা "বিছানা খালি নেই" একথা আর বলতে পারেন না। তখন কিঞ্চিৎ দুঃখপ্রকাশ করেন, যথাসময়ে রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে আসা যে কত অন্যায় হয়েছে সে বিষয়ে লম্বা লেকচারও হয়তো ঝাড়েন। বলেন, 'কেস হোপলেস', এখন আর কিছু করা যায় না। যখন করা যেত তখন কেন করা হয়নি— এ কৈফিয়ত কি দেশবাসী তাঁদের কাছে দাবী করতে পারে না? কিন্তু ধনী ব্যক্তিদের বেলায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। অসুখ হলে হাসপাতালের শয্যা দখল করতে তাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না অথচ দাতব্য চিকিৎসালয় মানেই তো এমন স্থান যেখানে দরিদ্র লোকদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। সেখানে ফলাও করে লেখা থাকে 'এই চিকিৎসালয় দরিদ্র রোগীদের জন্য'। অথচ কথায় ও কাজে কি গরমিলই না দেখা যায়। ধনী ও দরিদ্রের এই পার্থক্য কি ভারতে কি মালয়ে সর্বত্রই নজরে পড়েছে। আর মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন এই বিভিন্নতা? দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন না হয় এ-সমস্ত অবিচার আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি কিন্তু আজ 'স্বাধীন' ভারতে এর আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

মালয়ের হাসপাতালগুলোতে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছি—সেখানে মালয়ী রোগীর সংখ্যা এত কম যে তা আঙুলে গোনা যায়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম যে, হাসপাতালের ওপর মালয়ীদের বিরাগ ও ভীতি অত্যধিক। একথা শুনে মনে মনে ভেবেছি যে এর মূলে কি অর্থাভাব, শিক্ষার অভাব, না হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের উদার ও সদয় ব্যবহারের অভাব! আমার ধারণা উপরোক্ত তিনটি

কারণের মধ্যে মালয়ীদের হাসপাতাল-ভীতি ও শিক্ষার অভাবই মুখ্যত দায়ী। বৃটিশরা এদেশ থেকে এত টাকা লুঠছে, শিক্ষাবিস্তারের নামে এত স্কুল খুলেছে, কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর রোগযন্ত্রণা লাঘবের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না করতে পারলে তো সভ্যজগতের সমক্ষে লজ্জায় তাদের মস্তক অবনত হওয়া উচিত।

এখানকার প্রত্যেক গ্রামে একটি করে বাজার আছে। এখানকার বাজারগুলোতে শুটকিমাছের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ



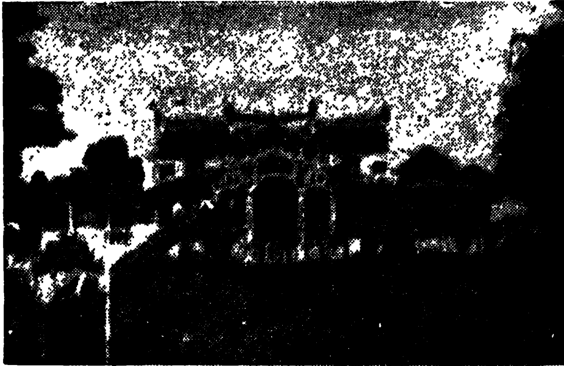
রাস্তার ধারে খাবারের দোকান

গ্রামেই একটা করে পাঠশালা আছে—তাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। পাঠশালাতে গেলে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেরা পাততাড়ি সুমুখে রেখে দুলে দুলে পড়া করছে। মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের ধমক কানে আসে। পাঠশালাগুলোতে হট্টগোলের আর অন্ত নেই। আমাদের দেশের মত এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অবস্থাও শোচনীয়। এই সব পাঠশালায় গভর্নমেণ্টের

তরফ থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয় তা নামমাত্র। শিক্ষকগণ যা মাইনে পান তাতে তাঁদের সংসারের খরচ কুলিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। সেদিন জনৈক বন্ধু আমায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর আতিথেয়তা আর উদার ব্যবহার মনকে মুগ্ধ করলে। তাঁর জীর্ণ মলিন শতছিন্ন বেশ ঘোর দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করছিল। ঘরে আসবাবপত্রাদি কিছুই নেই বললেই চলে। আমাদের মত মালয়ীরাও ভুলে গেছে যে জাতির ভবিষ্যৎ এই সকল শিক্ষকের হাতে। কাজেই জাতিগঠন করতে হলে সর্বাগ্রে এঁদের অবস্থার উন্নতি করা আবশ্যক। ওদিকে মালয়ের ইংরাজী স্কুলগুলোর অবস্থা অন্যরকম। সেখানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পড়ানো হয়। সে-সব স্কুল খাস বৃটিশের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। সেখানে শিক্ষকদের মাহিনা একশত থেকে চারশত ডলার (প্রতি ডলার এক টাকা নয় আনা)। এখানকার শিক্ষা বিদেশী পদ্ধতিতে চলে এবং ছাত্রদের মাহিনা এত বেশি যে গরীব মালয়ীরা তাদের ছেলেমেয়েদের ওখানে ভর্তি করতে পারে না। মালয়ে ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ৪১৯টি, মালয়ী স্কুলের সংখ্যা ৬০৭টি। মালয়ী ও তামিল স্কুলের অধিকাংশই পাঠশালা বললেই চলে। আর যে-উপায়ে এদের শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে তার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক,—এদের শিক্ষাপদ্ধতি যে খুব উচ্চস্তরের তা নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক যে মালয়ী ভাষার মাধ্যমে সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে, কেন না আজকের দিনে মালয়ী ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেক জায়গায় প্রচলিত আছে। এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষার মত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়ে এই ভাষা কথিত হয়।

যদি সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই ভাষা জানা উচিত। কেন না পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করার জন্যে আজ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। মালয়ী ভাষা খুব সহজ ও প্রাঞ্জল—এ ভাষাতে ব্যাকরণের খুব কড়াকড়ি নিয়ম নাই। আমাদের দেশ থেকেও ঐ ভাষায় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' মারফতে প্রত্যহই সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। সেই বেতারবার্তা পূর্ব এশিয়ার



চীনা মন্দির

ঘরে ঘরে পৌছে আমাদের পরস্পারের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করছে।

সমস্ত মালয় দেশের লোকসংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষেরও কিছু বেশি। এর মধ্যে মালয়ী উনিশ লক্ষ; আর বাকী চীনা, ভারতীয়, থাইবাসী, ইউরেশিয়ান ও ইংরেজ। মালয়ে মালয়ীর সংখ্যা শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ, যদিও চীনা ভারতীয় ও অন্যান্য জাতির সমন্বয়ে মালয়ী জাতি সংখ্যা-লঘু। তাই বলে যে মালয় দেশটি এই গরিষ্ঠ সম্প্রদায় শাসন করবে

তা হয় না। তারা সকলেই ভাইয়ের মত অবস্থান করবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম গণনায় মালয়ে চীনা, মালয়ী, ভারতীয় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিসাব :

	১৯৪১ সাল	১৯৪৭ সাল
মালয়ী	২২,৭৭,০০০	২৫,১৯,২২৪
চীনা	২৩,৭৮,০০০	২৬,১১,৩৯৭
ভারতীয়	৭৪,৪০০	৬,০৫,৪৩৭
অন্যান্য	১,০৯,০০০	৭৭,৭৭৮

চীনারাই হচ্ছে এখানকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি।

মালয়ের মধ্যে মালয়ীদের হিসাব :

স্ট্রেট-সেটেলমেণ্টে	২৫.৬	পার্সেণ্ট
পেরাকে	৩৫.৬	„
সেলাঙ্গরে	২৩.১	„
নেগ্রিসেম্বিলনে	৩৭.৩	„
জোহরে	৪৬.৪	„
পাহাঙে	৬১.৭	„
কেদাতে	৬৬.৬	„
ট্রেঙ্গানু ও কেলানটনে	৯১.৩	„

এখন এদের সামাজিক রীতি-নীতি ও উৎসবাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলছি। এদের বিবাহপ্রথা। আমাদের দেশে বর যেমন বরযাত্রীদলসহ কনের বাড়িতে যায়, এদেশে সেরকম নয়। কনেই এখানে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে বরের বাড়িতে যায় এবং আসল বিবাহ-অনুষ্ঠান সেখানেই সম্পন্ন হয়। মালয়ে পৈতৃক সম্পত্তির

উত্তরাধিকারিণী হয় মেয়েরা—ছেলেদের তাতে কোনো অধিকার থাকে না। বিধবারা ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার পাততে পারে। এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত আছে।

মালয়ীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। যে-কয়জন আছেন তাঁরা বেশির ভাগই সরকারী দপ্তরে চাকরী নিয়ে মালয়ের বিভিন্ন শহরে বাস করছেন।

এদের অনেকগুলি পত্রিকা আছে; তার মধ্যে "The Voice of People" প্রধান। মালয়ে থাকতে এই পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে পড়বার সুযোগ আমার হয়েছে। জোহরবারুর সুলতান এর পৃষ্ঠপোষক। পত্রিকাখানি যেমন উত্তম কাগজে পরিপাটিরূপে ছাপা হয় তেমনি এতে পাঠযোগ্য জিনিসও অনেক থাকে। এই কাগজের মুখ্য উদ্দেশ্য মালয়বাসীদের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করা, কিন্তু দুনিয়ার সকল মুসলমান যাতে ঐক্যবদ্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকার ভেতর দিয়ে পরোক্ষভাবে প্রচারকার্যও চালানো হয়। এতে মিশর দেশের রাজা-রাণী, জোহরবারুর সুলতান, মালয়ী মসজিদ ইত্যাদির ছবি প্রকাশিত হয়। কবিতাও নেহাৎ কম ছাপা হয় না। পারস্য ইরান প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান দেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ আমার নজরে পড়েনি। মালয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, তাতে একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হতো এবং আমি গভীরভাবে ভাবতাম আজ 'One Asia' অর্থাৎ 'এক এশিয়া' এটাই প্রত্যেক ভারতহিতৈষীর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কাজেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের কথা যত কম প্রচারিত হয় ততই ভারতবর্ষের তথা সমগ্র এশিয়ার মঙ্গল।

দ্বিজাতিতত্ত্ব বিজাতীয় শাসকদের মিথ্যাপ্রচারের ফলেই মাত্র একদল লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। ভাবী এশিয়ায় বিপুল সম্ভাবনাকে যেন আমাদের সাম্প্রদায়িকতা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে, সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। "The Voice of People" ছাড়া আরো দুটো দৈনিক পত্রিকা আমার হাতে পড়েছে তাতে দেখেছি এদের নিজেদের দেশের এবং দুনিয়ার খবর। কায়েদে আজম জিন্নার ছবি ও মাঝে মাঝে তাঁর বক্তৃতা, এদের পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

মালয়ের সাম্প্রতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছেন তন্মধ্যে মিঃ সি. ডি. আবদুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ সালে দাউদ-সম্পাদিত "The Voice of People" ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকাটি জনমত-গঠনে বিশেষ সহায়তা করছে।

আগেকার দিনে মালয়ীরা এখনকার মত হীনবীর্য ছিল না। তারা খুব সাহসী ও রণকৌশলী ছিল। তারা বিষাক্ত তীর আর বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করতো। দেশের স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যুকে তারা গ্রাহ্য করতো না—তার পরিচয় তারা বিশেষভাবে দিয়েছিল পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে। কিন্তু ইংরাজেরা মালয় অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে—এদের যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব কেড়ে নিলে। ধীরে ধীরে এরা এক নির্বীর্য জাতিতে পরিণত হলো। ইংরেজরা দাসত্বের নাগপাশ এমন কৌশলে এদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিলে যে এরা দাসসুলভ মনোবৃত্তিবশত বিদেশীর হুকুম তামিল করেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগলো। তাইতো ইংরেজের লেখায় এ-ধরনের কথা পাওয়া যায় যে মালয়ীরা নাকি বলে, "We Malayas, like to have our interest consulted, but when Government gives an order, we like to obey it." বিদেশী লেখক মালয়ীদের সম্বন্ধে একথা বলেন, "Politics do not

interest him much," অর্থাৎ রাজনীতিতে মালয়ীদের কোন আগ্রহ নেই।—আগে যাই হোক, একথা এখন আর মালয়ীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

মালয়ীরা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে রামায়ণের কথা ও কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা ও নাচ হয়। মালয়ীভাষায় লেখা রামায়ণের নাম 'হিকায়াত রাম', মালয়ের প্রতি ঘরে তা পঠিত হয়। আমাদের দেশেরই মত মালয়েও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাটির প্রদীপের সামনে পা ছড়িয়ে বসে স্থর করে রামায়ণ পাঠ করে। এই রামায়ণ-পাঠ শোনবার জন্যে তাদের গৃহপ্রাঙ্গণে পাড়ার বৃদ্ধা ও যুবতী স্ত্রীলোকদের আর ছেলে মেয়েদের ভীড় জমে যায়। রামায়ণের স্থখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা রামচন্দ্রের বীরত্বকাহিনী আজও তাদের গভীরভাবে অভিভূত করে। মালয়ের পর্বতগাত্রে ও গিরিগুহায় যে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত আছে—সেগুলো দেখলে একদা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এদের কিরূপ প্রভাবিত করেছিল তা বুঝতে পারা যায়। মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করা সত্বেও অনেক হিন্দু আচারানুষ্ঠান এদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। মালয়ের নৃত্যকলা শ্যাম, ইন্দোচীন, জাভা, বলী ও স্থমাত্রায় প্রচলিত নৃত্যেরই অনুরূপ। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নৃত্যের মধ্যে একটু আধটু ইতরবিশেষ যে নেই তা নয়।

মালয়ীরা জাত-শিল্পী। সূচী-শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পকর্মে এদের সহজাত নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কোয়ালা-লামপুরে বাটুরোডে মালয় দেশের একটি শিল্প-প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেখানে বিভিন্নস্থানের সূচী-শিল্পের যে-সমস্ত নিদর্শন জড়ো করা হয়েছিল সেগুলোর সূক্ষ্ম কাজ ও সৌন্দর্য আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলো। এদের পরনের কাপড় (সারং) ও জামার (কুবায়া) ওপর ছুঁচসূতো

দিয়ে এরা এত বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলে যে, এদের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। মালাক্কার বেতের ছড়ি, কেলানটন্ ও পাহাঙের বিচিত্র কারুশিল্প প্রদর্শনীটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছিলো। সেমাং ও সাকাই জাতির ছোট ছোট তীর আর ছোট ছোট হাতিয়ার, শ্যামদেশ ও চীন থেকে আনীত নানা দ্রব্য-সম্ভার, মালয়ের রং-বেরঙের ফুলের গাছ, নানাবিধ বিলাতী ও জাপানী মাল ইত্যাদি রকমারি জিনিসের সমন্বয়ে প্রদর্শনীটি বিশেষ চিত্তকর্ষক হয়েছিল। এ-ছাড়া টিন ও মাটির মিশ্রণে তৈরী pewter নামে একরকম ধাতুনির্মিত ছোট ছোট বাহারে জিনিসের আমদানী হয়েছিল প্রচুর। এগুলি খুব মজবুত এবং টেঁকেও বহুকাল। প্রদর্শনীটিতে স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। নার্সিং শিক্ষার একটা বিভাগ খোলা হয়েছিল। এতে বেশির ভাগ চীনা মেয়েরাই শিক্ষা নিচ্ছিল। এর সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। নানাদেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় প্রদর্শনীটি হয়েছিলো সর্বাঙ্গসুন্দর, তবে একথা সত্য যে মালয়ীরাই ছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী। এদের অক্লান্ত চেষ্টায়ই এটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো।

১৯৪০ সালের সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় সে বছর মালয়ে দুইশত মিলিয়ন পাউণ্ড জিনিসপত্র রপ্তানী ও আমদানী হয়েছে। এখান থেকে টিন ও রবার রপ্তানী হয়, আর তার পরিবর্তে খাদ্যবস্তু আর বিলাসদ্রব্য আমদানী হয়। মালয় গভর্নমেণ্টকে বহির্জগতের রপ্তানি ও আমদানীর ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়। রপ্তানির শুল্ক পাওয়া যায় শতকরা ৩০ ভাগ, আমদানীর শুল্ক শতকরা ২২ ভাগ মোট ৫২ ভাগ পাওয়া যায়। এই আমদানী ও রপ্তানীর বাজার মন্দা হয়ে পড়লে মালয় গভর্নমেণ্টকে বেশ বেগ পেতে

হয়। কারণ জনসাধারণের শুল্ক থেকে তাদের বিলাসের ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এদেশের বেশির ভাগ অর্থই বিদেশে চলে যায়—মালয়ীরা শুধু চাষের আর উৎপাদনের মালিক—গ্রাসের মালিক নয়। শুধু পেনাঙেরই রাজস্ব থেকে বার্ষিক ২০,০০,০০০ ডলার আয় হয়। এর প্রায় সবটাই ব্যয়িত হয় ইউরোপীয় জাতিসমূহের সুখ-সুবিধার জন্যে, যদিও কাগজপত্রে দেখান হয় যে, টাকাটা মালয়বাসীদের জন্যেই খরচ করা হচ্ছে। ১৯৩৮ সালের ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস থেকে যে রিপোর্ট বের হয়, তাতে লেখা আছে: "The outlay of considerable sums on health, education, housing, and communications...standard of living substantially higher than most eastern countries" "অর্থাৎ (মালয়ীদের) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহাদি নির্মাণ ও যাতায়াতব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে বহু অর্থব্যয় করা হয়। এখানকার জীবনযাত্রার মান অধিকাংশ প্রাচ্যদেশ থেকে অনেক উন্নত।" কিন্তু মালয়ে গিয়ে আমার যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমি জোরগলায় বলতে পারি যে, ইংরেজরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এ বিপুল অর্থের প্রায় সবটাই খরচ করে—মালয়ীদের ভাগ্যে জোটে ক্ষুদ-কুঁড়ো মাত্র। অথচ এদেরই কর জীবন-যাত্রার মানের অনুপাতে দিতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

মালয়ে ভারতীয়েরা

এবার মালয় প্রবাসী ভারতীয়দের কথা একটু আধটু বলা দরকার। সাধারণত এদের মধ্যে চাররকমের লোক দেখতে পাওয়া যায়। তারমধ্যে ভালমন্দ দুইই আছে। একদল হচ্ছে "পরশুরামের ঝুনঝুন-ওয়ালা বাটপাড়ের" মত সুদখোর চেট্টিয়া সম্প্রদায়, তারা জোঁকের মত

সর্বদাই মালয়ীদের রক্তশোষণ করে নিজেদের পকেট পুষ্ট করছে। আর একদল হলো ডাক্তার ও উকিলসম্প্রদায়। উকিল বলতে আমাদের বি-এল বা এম্-এ বি-এল পাশ করা আইনব্যবসায়ীদের কথা বলা হচ্ছে এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। কেননা ভারতে পাশ করা উকিল এখানে ব্যবসা করতে পারে না। বৃটিশরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের খাতিরে এই নিয়ম করেছে যে, বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী না পড়ে এলে এদেশে কাউকে আইনব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। ডাক্তার এম-বি হলেও চলে। সমগ্র মালয়ের মধ্যে সিঙ্গাপুরেই শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ আছে, আর কোথাও নেই। এখান থেকে লাইসেনসিয়েট ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। আমাদের এল. এম. এফ.দের চেয়ে তারা অনেক বেশি ভাগ্যবান। আমাদের এল. এম. এফ. বিলাতে গিয়ে নিজেদের কোন ডিগ্রী আনতে পারে না কিন্তু এখানকার লাইসেন্সিয়েটরা বিলাতে গিয়ে আমাদের এম. বি.দের মত নিজেদের কৃতিত্ব-অনুযায়ী ডিগ্রী নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এদেশে এম. বি. ডিগ্রী নেই, কিন্তু তাই বলে এরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না। অনেকে হংকং-এ এম. বি. বি এস. ডিগ্রি নিতে যায়। অনেক ভারতীয় ডাক্তার এখানে হাসপাতাল ও রবারবাগানে কাজ করছেন। আবার ওখানে কেউ কেউ বেশ প্র্যাকটিস জমিয়েছেন।

বাঙালী যে-কয় ঘর আছেন তা অন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প। এঁদের অনেকে যুদ্ধের পূর্বে ও ইংরেজের সাথে সাথে দেশত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বেশির ভাগ। অন্য ব্যবসায়ী খুব কম। এঁদের মন বেশ উদার ও বৃহৎ। সকলেই আমোদপ্রিয়, হেসে-খেলেই দিন কাটান। পাশ্চাত্য সভ্যতা এদের মধ্যে কারও কারও বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। মাতৃভাষায় পর্যন্ত কথা

বলতে কাকেও কাকেও বেশ বেগ পেতে হয়—লেখা ও পড়া ত দূরের কথা। সেবার একজন বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী আনন্দিত হয়ে তাঁদের ছেলেদের চিঠি আমাকে দেখিয়ে বললেন যে, তাঁদের ছেলেরা কেমন সুন্দরভাবে বাঙলাভাষায় চিঠি লিখতে শিখেছে। চিঠি দেখলাম—খুব ছোট ছেলের হাতের লেখা বলে মনে হলো, কারণ চিঠিটা বেশ ধরে ধরে লেখা। পড়লাম, —পড়ে বুঝলাম যে চিঠি ইংরাজীর বাংলা তর্জমা। প্রথমে 'আমার প্রিয় পিতা ও মাতা' পরে 'আপনাদের বিশ্বস্ত পুত্র'—তার নিচে নাম সই করা। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে পুত্রটির বয়স চব্বিশ। ছোটবেলায় এরা বাঙলা শেখবার সুযোগ পায়নি তবে নেতাজীর চেষ্টায় তাঁদের ছেলেরা এখন একটু শিখেছে। অন্যান্য ভাষায় তারা অনর্গল কথা বলতে পারে।

এখানকার পাঞ্জাবী শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কুলমাস্টার, কেরানি, ড্রাইভার ইত্যাদি আছে—অনেকে গো-পালন করে জীবিকা অর্জন করে। তবে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পুলিস-বিভাগে কাজ করতো। এই বিভাগে এদের সম্প্রদায় থেকেই বেশির ভাগ লোক নেওয়া হয়েছিল—কিন্তু যুদ্ধের সময় এরা আই. এন. এ.তে যোগদান করেছিলো বলে এদের কর্ম থেকে অবসরগ্রহণ করতে বৃটিশরা বাধ্য করলো। পাঞ্জাবী পুলিস বিতাড়ন করতে বৃটিশের যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিলো তা তাদের কূটনীতিরই পরিচায়ক। বৃটিশরা পরাজিত হয়ে যাদের ছিন্নবস্ত্রের মত পথপ্রান্তে ফেলে দিয়ে ভারতে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেই সব লোকেরা আই. এন. এ.তে যোগদান করে এমন কি মহাপাপ করেছিল যে তাই বৃটিশ মহাপ্রভুরা তাদের উপর খাপ্পা হয়ে উঠে তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করল!

এ-ছাড়া এখানে আছে দরিদ্র বুভুক্ষু রোগজীর্ণ কঙ্কালসার সিংহলবাসী ও মাদ্রাজী শ্রমিকসম্প্রদায়। ভারত থেকে রবারগাছ কাটবার জন্যে এখানে এদের পাঠানো হয়েছিল। অর্থোপার্জনের আশায় এরা হাজারে হাজারে এ দেশে এসেছিল—এদের মধ্যে সকলেই এই মালয়ের বুকে তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। ভুলের মাশুল দিতে এদেরই ছেলেমেয়েরা আজ অত্যাচারিত হচ্ছে। বৃটিশ রবার-ব্যবসায়ীর দল একদা প্রচুর প্রলোভন দেখিয়ে এদের এদেশে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে ভারতের সেইসকল প্রবাসী শ্রমিকদের স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গিয়েছে। এদের শ্রমার্জিত অর্থে বিদেশী বণিক আজ নিজেদের বাসের জন্যে গড়ে তুলেছে প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা আর এদের জন্যে তৈরী হয়েছে ছোট ছোট কাঠের ব্যারাক যা মনুষ্যবাসের অযোগ্য। ঘটনাচক্রে এই ব্যারাকে যাবার ভাগ্য আমার একদিন হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম দুর্ভিক্ষের নির্মম ছবি। জীর্ণশীর্ণ লোকগুলো ব্যারাকের নিচে বসে বসে হাঁপাচ্ছে—পরনে রয়েছে শতছিন্ন নেংটি, কাপড় নয়। মেয়েরা বের হতে পারছে না আমাদের দেখে, লজ্জায় ঘরের পাশে লুকিয়ে পড়ে। দরজা নেই যে দরজা দিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলাম—খাদ্যের অভাবে কঙ্কালসার হয়ে শুয়ে শুয়ে ক্ষীণকণ্ঠে শব্দ করছে। ম্যালেরিয়া বীজাণু প্রত্যেকটির রক্তে মিশে আছে—রক্তাল্পতা এত বেশি যে কারও কারও রক্ত লাল ছিল না। একটু দুগ্ধের অভাবে, দুটো অন্নের অভাবে আমাদেরই দেশবাসী আজ অকালে প্রাণ দিচ্ছে। আমার মনে আছে, আমি এ দৃশ্য দেখতে না পেরে কিছু অর্থ তাদের দিয়ে আসি। খাদ্যদ্রব্য কিছু দিয়ে আসতে পারিনি কেননা বৃটিশ আইনে বাধতো। এই আইন আমি শাসনের ভয়ে মানলাম—কিন্তু ঈশ্বরের আইন সেদিন মনে

প্রাণে ভেঙ্গে তাঁকে অপমান করেছিলাম বলে তা এখনও আমায় কষ্ট দেয়। এদের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল মাটির দুটো হাঁড়ি আর আমাদের খাদ্যদ্রব্যের শূন্য টিনের কৌটোগুলো। এদের মধ্যে আর একটি জিনিস দেখলাম—স্বামীরাই তাদের স্ত্রীর চরিত্রের জন্যে দায়ী—দুটো অন্নের জন্যে। এদের মধ্যে যৌনব্যাধির সংখ্যা অনেক বেশি। এদের সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আজও সম্পূর্ণ উদাসীন। মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে ভারতীয় শ্রমিক দল একদা দলে দলে এদেশে এসে হাজির হয়েছিল; কিন্তু যে অবস্থায় এই সুদূর প্রবাসে তাদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে তা অবর্ণনীয়।

মালয়ে পাশ্চাত্য-জাতি

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের উৎপীড়নে ও শোষণে প্রাচ্যের যে সকল দেশ আজ দুর্গতির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে মালয় তাদের অন্যতম। বাস্তবিক হতভাগ্য মালয়বাসীদের উপর বিদেশীর অত্যাচার ও উৎপীড়নের আর অন্ত নেই। মালয় দেশটিকে শোষণ করে বৃটিশ, চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধনিকসম্প্রদায়ের লোকেরা আজ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছে কিন্তু মালয়ীরা আজ পরপদানত ও সর্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। বিদেশীর দাসত্ব করেই তাদের দিন কাটছে। যেমন করে কৌশলী ইংরেজ জাতি বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে এসে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা করলে তাদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য তেমনি করেই একদিন তারা বণিকরূপেই মালয়ের উপকূলে এসে হাজির হয়েছিল ও সেখানেও বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল। দেশটিকে শোষণ করে শুধু নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই যেখানে ছিল গরীব মালয়ীদের ধানের ক্ষেত সেখানে

তারা রোপন করেছে রবাররক্ষের সারি। এর থেকে যে বিরাট আয় হয় তার প্রায় সবটাই এরা ভোগ করে। এখন সারা মালয়ে প্রায় ৩৫,০০,০০০ একর আবাদী রবাররক্ষের জমি আছে।

মালয়ে আবাদী জমির শতকরা ৬০ ভাগে রবার চাষ হয় আর মাত্র ১৫ ভাগে ধানের চাষ হয়। মোটামুটি আবাদী জমির পরিমাণ কোন-জাতির কতটুকু নিম্নে তার একটি হিসাব দেওয়া হলো।



রবার-বৃক্ষের সারি

যাদের জমি ৫০০০ হাজার একরের বেশি :

জাতি	মোট স্টেটের সংখ্যা	মোট একর জমির পরিমাণ
ইউরোপিয়ান	৪৭	৩৫১৪৫০
চীনা	২	১২০২১
ভারতীয়	×	×
অন্যান্য	৫	৪৮৭৮৫

যাদের ১০০০ হাজার থেকে ৯৯৯ একর জমি :

জাতি	মোট স্টেটের সংখ্যা	মোট একর জমির পরিমাণ
ইউরোপিয়ান	৪৮৬	১০০৩৪৫
চীনা	৫১	৮৭৫০০
ভারতীয়	৭	৯৩১৯
অন্যান্য	১৬	২৯৯১১
যাদের ৫০০ থেকে ৯৯৯ একর জমি :		
ইউরোপীয়ান	২১৮	১৬০৩৮৮
চীনা	১১১	৭৮২১১
ভারতীয়	২৫	১৬৯২৫
অন্যান্য	৮	৫২৫০
যাদের ১০০ থেকে ৪৯৯ একর জমি :		
ইউরোপীয়ান	৯৮৮	১৫৭৮০৪১
চীনা	১০৫১	৬৫১৯৩৭
ভারতীয়	৩৯৬	৯৩৮১৯
অন্যান্য	৮৭	৯৬০৬৪

১৯৪০ সালে শুক্‌নো রবার ৫৩৮৪৪৮ টন মালয়ের বাহিরে রপ্তানী হয়েছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ কোম্পানীরা শুধু তাদের শুক্‌নো রবার মাকিন পুঁজিপতিদের বিক্রয় করে রোজগার করেছে প্রায় ১৭ কোটি ডলার। মালয়ের মোট রপ্তানীর ৩০ ভাগ শুধু মার্কিন পুঁজিপতিদের হাতে গিয়েই পড়েছে, মালয়ে টিন, রবার ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যুদ্ধের পূর্বে প্রায় দশকোটি পাউণ্ডের ওপর আয় ছিল—যেটার মালিক সমস্ত ইউরোপিয়ানরা। মহাযুদ্ধের সময় যখন মালয়দেশ জাপ-অধিকৃত হলো তখন আমেরিকান গভর্নমেণ্ট কৃত্রিম উপায়ে রবার তৈরী করবার জন্যে

অনেক ল্যাবরেটরী তৈয়ার করলো এবং অনেক চেষ্টার পর যখন তারা সত্যই কৃতকার্য হলো তখন রবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারীর কাজ সেই কৃত্রিম রবারের দ্বারা সাধিত হলো। কিন্তু মহাযুদ্ধের পরও তাদের এই কৃত্রিম রবার উৎপাদনের জন্য আসল রবারের চাহিদা একেবারে কম হয়ে গেল। কেননা আসল রবারের মূল্য কৃত্রিম রবারের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। আসল রবার বিক্রয় করতে হলে এখন কৃত্রিম রবারের সমমূল্যে আর না হয় তার চেয়ে কিছু কমে বিক্রয় করতে হবে। আর কম মূল্যে বিক্রয় করতে হলেই শ্রমিকদের ওপরই সেই চাপটা এসে পড়তে বাধ্য হয়, কেননা মালিকরা ত আর লভ্যাংশ অল্পহারে নিতে চায় না।

রবারের রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে মালয়ের আর একটি সম্পদ টিনও পাশ্চাত্য দেশে চলে যায়—এ থেকে ইউরোপিয়ানরা প্রচুর লাভবান হয়।

১৯৪০	সালে	৮৫৩৮৪	টন	রপ্তানি	হয়
১৯৪১	”	৬৮০০০	”	”	”
১৯৪২	”	১৫০০০	”	”	”
১৯৪৩	”	১৫০০০	”	”	”
১৯৪৪		১৫০০০			

এই সব মালিকেরা টিনের খনির শ্রমিক ছাড়া রবার-বাগানের স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করেও কিন্তু ক্ষান্ত নয়। উপরন্তু ছোট ছোট শিশুদের পর্যন্ত রক্তশোষণে বদ্ধ-পরিকর। সেই সব স্ত্রীপুরুষ ও শিশু শ্রমিকদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ফেডারেটেড স্টেট্‌স

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু
ভারতীয়	৭৯৮৭১	৪১৪৫৭	১৫১৩৮
চীনা	২৮০৩৫	১৪৮৩৭	১৭০৯
জাভানীজ	২১২৩	৩৮২	৭১
মালয়ী	৩৬৭৮	৬৪১	২০৯
অন্যান্য	১৩১	৫	৩

আনফেডারেটেড স্টেট্‌স

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু
ভারতীয়	৪২৬৯৮	১৮৯২৭	৪৭০৬
চীনা	২৯৮৪২	৬৮৯৯	৮৯২
জাভানীজ	৭৬৩৭	২২৪৫	৪৯২
মালয়ী	১২২৮৪	৫২৩৩	৬৫৮
অন্যান্য	২৩৭	১০	২

স্ট্রেটসেটেলমেণ্ট

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু
ভারতীয়	৯৫৯৭	৪৬৯৬	১৩৬৩
চীনা	৪৮৫৫	১১৭৩	২০৪
জাভানীজ	৯১৯	২৯৩	১৪৫
মালয়ী	৫৪৬০	১৬৬৯	১৭৮
অন্যান্য	২৫	৩	×

মালয়ীরা এখন এতটা পরনির্ভরশীল হয়েছে যে বিদেশ থেকে খাদ্য না এলে এদের ক্ষুধার অন্ন জোটে না, আর বস্ত্র না এলে পরনে বস্ত্র ওঠে না। মালয়ে ইংরাজের অত্যাচার আজ সীমা অতিক্রম করেছে।

এই অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা তীব্র অসন্তোষ আজ মালয়ে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। ব্যাপক বিদ্রোহের সূচনা আজ সেখানে দেখা দিয়েছে। মালয়ের পত্রিকাগুলোতে এ বিদ্রোহের সুরই তীব্রভাবে বেজে উঠছে। এদের সহজ সারল্যের সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা এদের সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করেছে। এই বঞ্চিত নিপীড়িত জাতি শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে চাইছে—কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। এরা জানে এদের পেছনে আছে সমগ্র এশিয়ার সম্মিলিত শক্তি, তাই



ফেরিওয়ালা

শ্বেতাঙ্গজাতির অত্যাচারের প্রতিরোধ করবার জন্যে আজ এরা বদ্ধপরিকর।

যুদ্ধের দুর্যোগ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ ধুরন্ধরগণ মিলিটারী শাসন-কর্তাদের কাছ থেকে মালয়ের শাসনভার নিজেরাই নিতে মনস্থ করে বৃটিশ মালয়ান এডমিনিষ্ট্রেশন নাম নিয়ে মালয়ের শাসনকাজ চালাতে আরম্ভ করলো। এই সব শাসকদের দলকে মিলিটারী

লোকদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হলো। এরা আধা-মিলিটারী আর আধা-সিভিলিয়ান হয়ে রইল। সিভিলিয়ানদের উপর শাসনকার্য চালাতে লাগলো। আবার দরকার পড়লেই মিলিটারীর সাহায্য নিতে লাগলো। এতে ভারতবাসীদের নেওয়া হলো বটে, কিন্তু তাদের ওপর সর্বদাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল, কেননা এই সময় চীনারাই গরিলবাহিনী গঠন করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিল।

রয়টার-কথিত এই গরিলার দলকে অনেকে সন্ত্রাসবাদ ও দস্যুর কার্যকলাপ বলে খুব সোরগোল আরম্ভ করে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি দুঃখের বিষয় যে ভারতীয় দূত মিঃ থিবি পর্যন্ত এই সকল দেশপ্রাণ মুক্তি-যোদ্ধাদের সন্ত্রাসবাদী বলে সকলের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। ষ্ট্রেট্-টাইমস্ ১৯শে জুন তারিখে লিখেছে যে বর্তমানে এশিয়াবাসী কমিউনিস্টদের (!) ইউরোপিয়গণ থেকে বেশি প্রস্তুত বলে মনে হয়। তাদের সংখ্যা দশহাজার বলে ধরতে পারা যায়। রবারবাগানের মালিক, পুলিস এবং সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুলিস ও সৈন্যবিভাগ রবার বাগানের মালিকদের নিয়ে ছোট ছোট দল করে আত্মরক্ষার জন্যে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে এই বাহিনীটি গঠিত হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মালয়ে রয়টার-কথিত এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু চীনা গরিলাবাহিনীই নয় বরং তার সঙ্গে মালয়ের সমস্ত জনগণ জড়িত হয়ে রয়েছে; আর অপরদিকে রয়েছে সঙ্গীন উঠিয়ে সেই জনগণপীড়ক সামরিক কর্তৃপক্ষ, রবার ও টিনখনির মালিকের দল। প্রথম দিকে যখন আমি মালয়ে ছিলাম তখন পত্রিকার মধ্যে দেখতে পেতাম যে এই দলটি চীনাদেরই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু যখন মাঝে মাঝে মালয়ী ও ভারতীয়েরাও এই দলের সঙ্গে যোগদানের জন্যে ধরা পড়তে লাগলো

তখনই আমার ধারণা হয়েছিল যে মালয়ে প্রত্যেকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে—বিদেশী বণিকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।... চীনা ও ভারতীয় ধনিকেরা এই গণ্ডগোলের মধ্যে পা বাড়ায়নি, বাড়িয়েছে সমস্তই শ্রমিকের দল। এরা হচ্ছে মালয় জাতীয় দল, মালয় কমিউনিস্ট দল, গণতন্ত্রী যুবসংঘ আর মহিলা ফেডারেশন। এই সবকটি দল নিয়ে মালয় গণতন্ত্রী ইউনিয়ন গঠিত। এরাই এই বিদ্রোহের সূচনা ছড়িয়ে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়িয়ে দিয়েছে। এই সর্বহারা



শ্রমিক-অঞ্চল

দেশের মুক্তিকামী দল নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে যদি দেশের স্বাধীনতা বহন করে আনতে চেষ্টা করে থাকে তাহলে সন্ত্রাসবাদী বলে তাঁদের আমরা হেয় করতে যাই কেন! এই শোষিত অত্যাচারিত জনগণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সভ্যজাতিরা সকলেই মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে। তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এদের ধ্বংস করবার জন্য আজ তারা বদ্ধপরিকর। এই জন্যেই অস্ত্র ও লোকবল ঝাঁকে ঝাঁকে মালয়ের বুকে

এসে নামছে ; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া দূরের কথা ভারত পর্যন্ত এর সাহায্যে বাদ পড়েনি। ভারত থেকেও গুর্খার দল দিল্লীর বুকের ওপর দিয়ে মালয়ের বুকে অভিযান শুরু করেছে--মালয়কে পরাধীনতা নাগপাশে বাঁধবে বলে। আমার একজন ইংরাজ বন্ধু মালয়ে বলেছিলেন যে, এই গুর্খার দলের সাহায্যে মালয়ের গোলমাল দূরের কথা ভারতের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অনায়াসে চিরতরে ধূলিসাৎ করে দেওয়া যায়। এই অন্যায় কথাটা বলেই তিনি একটু লজ্জিত হয়ে আমার কাছে মাপ চাইলেন কেননা আমি যে একজন ভারতীয় সেটা তিনি বলবার সময় ভুলে গিয়েছিলেন।

এই যে গুর্খার দল মালয়ে যাচ্ছে এ দোষ কার ভারতের জনগণের না দেশের কর্ণধারদের! যারই হক, এ পাপ যে সমস্ত জনগণকেই অর্সাবে সেটা নিশ্চিত। পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এইসব গুর্খা সৈন্য বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত—ভারতীয় বাহিনীর নয়। এ দোষ তবে কার?—ভারতের নয়, নেপালের নয়, পাশ্চাত্যজাতির নয় (কারণ তাদের যে স্বার্থহানি হচ্ছে), তবে কি নিরাপত্তা পরিষদের—না এই অত্যাচারিত জনগণের ভাগ্যের দোষ? এই যে বিরাট দাবানল মালয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এর জন্যে কি নিরাপত্তা পরিষদ তাঁদের সদিচ্ছায় একটি মিশন পাঠিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন না যে কেন এরা এই দাবানলে অসংখ্য প্রাণী আত্মাহুতি দিচ্ছে? এ সংবাদ পরিষদের কাছে দেবার লোক নেই বলে কি অন্যায়ের প্রতিরোধ হবে না? মনে পড়ছে আটলান্টিক সনদের কথা—কত বড় বড় হরপে জাহির হয়েছিল সারা পৃথিবীতে সমস্ত পরাধীন দেশের জনগণকে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু হায়! যাঁরাই এই সনদের চুক্তিতে সই করেছিলেন তাঁরাই আবার যুদ্ধের পর মুখ

ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। চার্চিল সাহেব ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা শুনে গালে হাত দিলেন। আবার অন্যান্য দেশকে স্বাধীনতা দানের কথা শুনে বেশ জোরের সঙ্গে স্পষ্ট কথায় সাধারণ জনগণকে জানাবার জন্যে তিনি বলেছিলেন যে দেউলিয়া বৃটিশরাজত্বের ওপর মন্ত্রিত্ব করবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই নেই।

যদিও সমস্ত শোষকশ্রেণী সব সময়ে সাবধান হয়ে কথা বলবার অভ্যাস রাখেন—কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন অপ্রিয় সত্য কথা হলেও মুখ দিয়ে সেটি বের করে ফেলেন। তাই শ্রমিক-অসন্তোষের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রধান কর্মকর্তা ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ঘোষণা করলেন যে কমিউনিজম প্রাচ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—তাকে চরম আঘাত হানতে হবে। এই শ্রমিক-আন্দোলনই যে চীনা গরিলার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তা জেনেশুনেই এই সত্যকথাগুলি বলে ফেলেছিলেন।

এই কমিউনিস্টদের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকেরাও যে বিশেষভাবে জড়িত তা ভালভাবেই প্রকাশ পেল যখন মালয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জরুরী আইনের বলে ১৫০ জন ভারতীয়কে বন্দী করলে। এঁদের মধ্যে মালয়ের ভারতীয় কংগ্রেসের জনৈক সদস্য এবং জাপ-বিরোধী গণফৌজের জনৈক ভারতীয় সদস্য রয়েছেন। মালয়ীদের মধ্যেও অনেকে এই বিদ্রোহীদের দলে থাকায় কোয়ালা-লামপুরের পুডু জেলে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। লেনিনের কথায় বলা যেতে পারে যখন অত্যাচার চরমে ওঠে তখনই জন্ম হয় বিদ্রোহের। মালয়ীরাও নির্জীব ছিল—কিন্তু অত্যাচারীর অত্যাচারের ফলে আজ সেই ভীরু নির্জীব মালয়ীরা হাসিমুখে ফাঁসির হার গলায় দিচ্ছে। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির

সম্পাদক মিঃ হ্যারি পলিট্ টাইমসে এক চিঠিতে মালয়ের বিদ্রোহ-সম্বন্ধে লিখেছেন যে, মালয়ের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমস্ত মালয়বাসীই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। পত্রিকা পড়লে বা রেডিওতে বি. বি. সি.র খবর শুনলে সব সময়েই কানে আসে যে স্বাধীনতাকামী মুক্তিফৌজের দল সব সন্ত্রাসবাদী, তবে সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করলে বলে যে গরিলার দল কমিউনিস্ট দলভুক্ত ও তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু



পুডু জেল

তাদের সঙ্গে যে এদের অন্তরের মিল রয়েছে তা তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়—যাকে সোজাকথায় বলা হয় 'কমিউনিস্ট-মাইনডেড'।

এই রয়টার-কথিত চীনা গরিলারাই যে এই দুর্যোগের জন্য একলা দায়ী এটা বললে ভুল হবে। কারণ বৃটিশরা যুদ্ধের আগে থেকেই চীনাদের সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন করে আসছে—মালয়বাসীদের কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করা দূরের কথা—সাহায্যের পথ পর্যন্ত নির্দেশ

করে দেয়নি। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে এদের সভ্যতা দুইশত বৎসর পিছিয়ে গেছে বললে ভুল হয় না। চীনারা এদের তুলনায় শিক্ষায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারপর যখন বৃটিশরা সাফল্যের সঙ্গে মালয় থেকে পশ্চাদপসরণ করলো তখন জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্যে চীনাদের যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র সাদরে গ্রহণ করালো। সেইসময় জাপানীদের সঙ্গে চার বছর গরিলাযুদ্ধ চালিয়ে—চীনারা আরও শক্তি তাদের বাড়িয়ে ফেললো। তারপর আবার জাপানীরা যখন মালয়ে আত্মসমর্পন করলো—তখন তারা তাদের সমস্ত ভাল ভাল যুদ্ধাস্ত্রগুলি চীনাদের হাতে সমর্পণ করলো—বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে। তাদের মধ্যে কতক জাপানী অফিসারও গোপনে মিলিত হয়ে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে লাগলো। এই ব্যাপার সাধারণে জানাজানি হলো যখন মাঝে মাঝে জাপানীরা গরিলাদের সঙ্গে বন্দী হতে লাগল।

এই ভুলের মাশুলের জন্যে কত মূল্যবান প্রাণ আহুতি দিচ্ছে ও দেবে তা কে বলতে পারে? চীনা গরিলারা মনে করে মালয় দেশ বিদেশীর নয় এটি তাদের নিজস্ব দেশ, কারণ মালয়ে যত উন্নতিসাধন হয়েছে এর মূলে রয়েছে তাদের সমগ্র উৎসাহ, পরিশ্রম ও অর্থ। নিজেদের তারা বিদেশী বলে মনে করে না। এইজন্যেই তারা সমস্ত মালয়বাসীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজদের মালয়দেশ থেকে তাড়াতে চাইছে—যেমন করেই হোক কৌশলে বা জোরজবরদস্তিতে।

মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়েরা যে-চোখে বৃটিশদের যুদ্ধের পূর্বে দেখে এসেছিল সেই দৃষ্টিটা কখনও যুদ্ধের পরে থাকতে পারে না। কারণ জাপানীরা যদিও রাজ্যশাসনে বা লোকদের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করতে অপটু ছিল তবুও মালয়বাসীদের এটা বোঝাতে তাদের কষ্ট হয়নি যে

পাশ্চাত্যজাতিগণ এশিয়াবাসীর দিকে সর্বদাই লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাই যখনই পাশ্চাত্যজাতিরা মালয় জয় করার পর তাদের সেই পূর্বেকার লোলুপদৃষ্টি তারা এশিয়াবাসীদের ওপর নিক্ষেপ করলো তখনই মালয়ে গোলমাল শুরু হলো, সেই গোলমাল থেকে হলো বিদ্রোহের সূচনা। সেই বিদ্রোহ এখন দাবানলের মত সারা মালয়ে ধূ ধূ করে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। সে দোষ কার—এশিয়াবাসীর না দাম্ভিক পাশ্চাত্যজাতির? আশে পাশের প্রায় সব দেশগুলো আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেচে আর মালয় পড়ে আছে সেই পরাধীনতার গভীর অন্ধকারে। অন্ধকার থেকে আলোকের পথে তারা আসতে চায়—তাতে যদি সমস্ত মালয়দেশ ধ্বংসে পরিণত হয়ে যায় সেও ভাল। পরাধীনতার শৃঙ্খল পরে বেঁচে থাকার চেয়ে—মৃত্যুই তাদের শ্রেয়ঃ হবে।

সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বার্থ ভারতেরই স্বার্থ। ঐতিহাসিক যুগ থেকে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সবসময়ে ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত। আশেপাশের দেশগুলো যেমন জাভা, সুমাত্রা বোর্নিও, থাইলাণ্ড ও বর্মা যদিও তাদের বিভিন্ন শাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যা ভিন্ন তবুও তাদের সমস্যা এক—সে সমস্যা হচ্ছে জনগণপরিচালিত একটি স্বাধীন দেশ। বৃটিশ এই সুন্দর ছবির মত উপদ্বীপটি হাতছাড়া করতে নারাজ, তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এটি রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। আর তাদের শক্তিকে পুষ্ট করতে আমেরিকা নিজে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করবে, কেননা তাহলে তাদের হাতে থাকবে পৃথিবীর অতুল সম্পদ টিন ও রবার।

বৃটিশ মালয়ান এডমিনিষ্ট্রেশন হবার কিছুদিন পরেই মালয়বাসীরা

স্বাধীনতার জন্যে এখানে ওখানে আন্দোলন চালাতে লাগলো। বৃটিশ কর্তারা ভয় একটু পেলো—কিন্তু চাচিলি বুদ্ধিতে তারা একটা চাল্ চাললো সেটা হচ্ছে মালয়ান ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নটিকে তারা মালয়ীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইলো। এর মধ্যে নিয়ে আসা হলো সমস্ত মালয় দেশটাকে—কেবল মাত্র বাদ দেওয়া হলো সিঙ্গাপুরকে। সমস্ত সুলতানদের প্রতিপত্তি গেল ধূলিসাৎ হয়ে—তারা কেবল একটা বৃটিশের পেনসনভোগী জীব হয়ে রইলো। কিন্তু নবজাগ্রত মালয়ীরা আর বৃটিশের ফাঁদে পা দিতে রাজী নয়, তাই এই ইউনিয়নটিকে তারা তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে পারলো না। সুলতানরা প্রথমে এটিকে মেনে নিতে নিমরাজী হয়েও এসেছিলেন—কিন্তু সহসা এর বিরুদ্ধে সমগ্র মালয়বাসীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠলো। শেষে সুলতানরাও জনমতের সঙ্গে সুর মেলাতে লাগলো, বৃটিশের কূটনীতি ব্যর্থ হলো। তারা তখন মালয়বাসীর সঙ্গে মিটমাট করবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলো। তাই এই ইউনিয়নটাকে ১৯৪৮ সালের মার্চমাসের শেষের দিকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো। এরপর এরা আর এক চাল চাললো—এর নাম দেওয়া হয় ফেডারেশন অফ মালয়। এটির জন্ম হলো ১৯৪৮ সালের এপ্রিলমাসের প্রথম ভাগে।

এই নূতন ফেডারেশনের মধ্যে প্রবেশ করলো সব রাজ্যকটাই, মালক্কা ও পেনাং বাদ গেলো না—শুধু বাদ দেওয়া হলো সিঙ্গাপুরকে। এতে সুলতানদের একটু বেশি ক্ষমতা দেওয়া হলো—তবে সুলতানদের পরামর্শ দেবার জন্য একটি করে বৃটিশ এ্যাডভাইসর নিযুক্ত হলো; তার পরামর্শ মত রাজ্যের রাজকার্য চলে। তবে সমস্ত নূতন ও পুরাতন বিষয় প্রত্যেকটি সুলতানের প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষ। আমাদের দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের মত এদেশেও কেন্দ্রীয়

লেজিসলেটিভ এসেম্বলী কোয়ালা-লামপুরে স্থাপিত হয়েছে ও এখানে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। ইনিই এই ফেডারেশনের কর্ণধার। আবার এই কর্ণধারটি সিঙ্গাপুরের কমিশনার জেনারেলের দ্বারা পরিচালিত হন। কমিশনার জেনারেল বিলাতের কলোনিয়াল অফিসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এখন এই জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের পুত্র মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড।

এই কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলী দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটী আপার হাউস ও অন্যটী লোয়ার হাউস। আপার হাউসে থাকেন সমস্ত সুলতানরা আর তাঁদের প্রেসিডেণ্ট হাই কমিশনার; আর লোয়ার হাউসে ইলেক্টেড ও নমিনেটেড মেম্বাররা থাকেন। এইরকমভাবেই শাসনকার্য মালয়ে আজ চলেছে। যে দুর্যোগ ধীরে ধীরে মহাপ্রলয়ের রূপ ধরছে—তাতে করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কতদিন আর এশিয়ার বুকে এমনি করে গা-ঢাকা দিয়ে তাদের রাজত্ব চালাবে কে বলতে পারে!